হানামি

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আট আনা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

গল্পগুলি জাপানী গল্প অবলম্বনে রচিত, ইতিপূর্ব্বে প্রবাসী, প্রতিভা ও ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

হানাষি জাপানী শব্দ, ইহার অর্থ কথা বা গল্প।

বাণীর বরপুত্র, প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রচ্ছদপটের জন্য পুস্তকের নামটি জাপানী ছাঁদে লিখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন
১৩১৯ } সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিমিকো

(১)

যে দিন শুনা গেল কিমিকো তার শিক্ষয়িত্রী কিমিকার বাড়ী হইতে কোন্ এক অজ্ঞাতনামা পুরুষের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে, সে দিন সহরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বিশেষতঃ ধনিসন্তানমহলে। কত শত ধনীর সন্তান ধন, প্রাণ, মান বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াও যার কণামাত্র স্নেহলাভে সমর্থ হয় নাই, রাশি রাশি মূল্যবান উপহার দিয়াও যার মন টলাইতে পারে নাই, দেশ বিদেশাগত

যুবকেরা পঙ্গপালের মতো যার পিছু পি ঘুরিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে, এহে কিমিকোর হৃদয় যে অবশেষে গলিয়াছে, কথা বিশ্বাস করিতে সহজে কাহারো প্রবৃ হইল না।

কিন্তু কথাটা সত্য। অসামান্যরূপলাবণ্য সম্পন্না নর্ত্তকী কিমিকো সকলেরই প্রিয়পাত্রী ছিল। এমন কি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও কখনো তার নাম ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের সহিত উল্লেখ করিতেন না। কিমিকো কোনো পরিবারে কখনো অশান্তির সৃষ্টি করে নাই ; ঘরভাঙানো দোষ কেহ তাহাকে দিতে পারিত না। সে নিজে ছিল ভাস্করখোদিত শুভ্র মর্ম্মরমূর্ত্তির মতো ; লোকে বলিত তার হৃদয়টাও ঐ প্রস্তরেরই মতো কঠিন, স্নেহহীন !

(২)

কিমিকো ও অন্যান্য নর্ত্তকী মধ্যে প্রভেদ ছিল অনেক। তার মধ্যে প্রধান, সে ভদ্র-

বংশজাত। তার আগেকার নাম ছিল 'আই', যার অর্থ—প্রেম, ভালবাসা; আর একটা অর্থ দুঃখ। 'আই'এর কাহিনী প্রেমের কাহিনীও বটে, আবার দুঃখের কাহিনীও বটে!

সে বেশ সুখে লালিত হইয়াছিল। শিশু-কালে সে এক বৃদ্ধ 'সামুরাই'এর ইস্কুলে যাইত। ছোট্টো মেয়েগুলি সেখানে আসন বিছাইয়া এতটুকু উঁচু এক একটি ডেস্কের সামনে বসিত। শিক্ষকেরা সেখানে বিনা বেতনেই শিক্ষা দিতেন। ইস্কুলে যাইবার সময় ও প্রত্যাবর্ত্তনের সময় প্রত্যহ ভৃত্য তার পড়িবার বই, লিখিবার বাক্স, বসিবার আসন ও ছোট্ট টেবিলখানি বহন করিয়া লইয়া যাইত।

তারপর সে একটি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। সেই সবেমাত্র 'আধুনিক'—পাঠ্যপুস্তকসকল বাহির হইয়াছে। সে সব পুস্তকে ইংরাজি জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত আত্মসম্মান, কর্ত্তব্য, বীরত্ব

প্রভৃতি বিষয়ে কত কাহিনী! আর তাহাতে পাশ্চাত্যদের কত অপূর্ব্ব বিচিত্র ছবি!

আই অল্পকালের মধ্যে অনেক শিখিয়া ফেলিল, পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অনেক পারিতোষিকও লাভ করিল।

তারপর জাপানে পরিবর্ত্তনের যুগ আসিল। সেই ভাঙাগড়ার আবর্ত্তে পড়িয়া কত অবস্থাপন্ন পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়িল, আবার কত দরিদ্র রাতারাতি আমীর হইয়া গেল। আইকে ইস্কুল ছাড়িতে হইল। দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া বেচারা যখন চোখ মেলিল, তখন দেখে আছে কেবল মাতা আর শিশু ভগ্নীটি। মাতা এবং আই বুনন ছাড়া আর কিছু জানিত না এবং তদ্দারা গ্রাসাচ্ছাদন চলা অসম্ভব। তাই প্রথমে বসতবাড়ী ও জমিজমা, তারপর ক্রমে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, গালা-করা বা[illegible], অলঙ্কার ও অন্যান্য পৈত্রিক অস্থাবর সকল সম্পত্তি

জলের দরে বিকাইয়া গেল। একের দুরবস্থায় অন্যে যারা ধনী হয়, তাদের অর্থ বাস্তবিকই "চোখের জলেরি অর্থ!" জীবিতের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না; কারণ অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব সামুরাই পরিবারেরও সমান দশা। অবশেষে একদিন আইএর ইস্কুলের বইগুলিও বিক্রীত হইয়া গেল, তখন মৃতের নিকট সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

আইএর পিতামহকে তাঁর তরবারির সহিত সমাহিত করা হইয়াছিল। সে তরবারি-খানি এক 'দাইম্যো' পিতামহকে উপহার দিয়াছিলেন। কবর খুঁড়িয়া তরবারির স্বর্ণ-মণ্ডিত বহুমূল্য হাতলটি খুলিয়া লইয়া উহার স্থানে একটি সাধারণ হাতল পরাইয়া দেওয়া হইল। খাপের উপর হইতেও মূল্যবান্ ধাতু-গুলি উঠাইয়া লওয়া হইল। রহিল কেবল অসির ফলক; সেখানি ত লওয়া যায় না,

উহা যে যোদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজন! রক্ত-মৃত্তিকানির্ম্মিত সমাধির মধ্যে আই দেখিল তার মৃত পিতামহ সোজা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। এতদিন সমাহিত থাকা সত্ত্বেও তার মুখ কেমন অবিকৃত! তরবারিখানা যখন ফেরত দেওয়া হইল, মনে হইল যেন মাথা নাড়িয়া মৃত যোদ্ধা এই কার্য্যে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে!

অবশেষে আইএর মাতা পীড়িত হইলেন। চরকায় কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। মৃতের সহায়তায় প্রাপ্ত অর্থও নিঃশেষিত হইয়াছে। আই কহিল, "মা, এখন কেবল একমাত্র উপায় আছে। আমি নর্ত্তকীদের নিকট বিক্রীত হব।" মাতা উত্তর দিলেন না, কেবল চোখের জল ফেলিলেন। আই কাঁদিল না, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তার মনে পড়িল, সুখের দিনে তাদের

বাড়ীতে যখন ভোজ হইত, তখন নর্ত্তকীরা মদ্য পরিবেষণ করিত। নর্ত্তকী কিমিকা তাহাকে সর্ব্বদাই আদর করিত। সেই কিমিকার নিকট উপস্থিত হইয়া আই কহিল, "তোমাকে আমায় কিনতে হবে, কিন্তু আমার অনেক টাকা দরকার।" সে তার করুণ কাহিনী সমস্ত বলিল, চোখে তার এক বিন্দু অশ্রুও দেখা গেল না। কিমিকা তাহাকে সান্ত্বনা দিল, আহার করাইল; তারপর কহিল, "বাছা, তোমাকে অনেক অর্থ দিবার সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার মাতার ভরণপোষণের ভার আমি গ্রহণ করব। তোমার মাতার বড় ঘরে জন্ম, ব্যয়সঙ্কোচ তিনি করতে পারবেন না। তাই তাঁর হাতে অর্থ না দেওয়াই ভাল। তোমার মাতাকে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বল যে, তুমি আমার নিকট চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বা ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত

থাকবে। এই সামান্য অর্থ এখন দিচ্ছি, নিয়ে যাও।”

এইরূপে আই ‘গেইযা’ হইল। কিমিকা তার নাম রাখিল, কিমিকো। সে তার মাতা ও শিশু ভগ্নীর ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। কিমিকো খ্যাতিলাভ করিবার পূর্ব্বেই তার মাতার মৃত্যু হইল।

(৩)

কিমিকোর হৃদয় যে হরণ করিয়াছিল, সে ধনী পিতামাতার স্নেহের নন্দন, একমাত্র পুত্র।

উচ্চ, স্তব্ধ, দেয়াল-ঘেরা, বিস্তৃত ছায়াশীতল উদ্যানের মধ্যে বাড়ী—যেন কোন্ পরীরাজ্য! জগতের কর্ম্মকোলাহল এখানে পৌঁছে না, চতুর্দ্দিকে কেবল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। এ যেন সেই বাঞ্ছিত দেশ—শতব্যাধিপীড়িত মানব যেখানে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে!

এমনি একটি বাড়ীতে বাস করিয়া বসন্ত কাটিল গ্রীষ্ম আসিল, কিন্তু কিমিকো কিমিকোই রহিল! তিন বার সে বিবাহের দিন পিছাইয়া দিয়াছে।

কিছুকাল এইরূপে গেল। এক দিন কিমিকো ধীরে ধীরে, দৃঢ়তার সহিত তার প্রেমাস্পদকে কহিল, "অনেক দিন বলি বলি করে বল্‌তে পারিনি। আমার মা আর আমার ছোট বোনটির জন্যে আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেচি। সে সব চুকে গেছে, কিন্তু বুকের ভিতর যে আগুন জ্বল্‌চে তা এখনো নেবেনি,—কখনো নিব্‌বে বলেও বোধ হয় না। তোমার পুত্রের জননী হওয়া, তোমার ঘরের গৃহিণী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমার পত্নী হয়ে তোমার লজ্জার কারণ আমি হব না। আমি তোমার খেলার সাথী, তোমার সহচরী, তোমার ক্ষণেকের অভ্যাগত, —তাও অর্থের জন্যে নয়। যখন আমি

তোমার কাছ থেকে চলে যাব, তখন সব বুঝতে পারবে। আমার প্রেম তখনো তোমারই থাকবে, কিন্তু সে প্রেম এখনকার মতো নয়; এখনকার প্রেম মত্ততা, নির্ব্বুদ্ধিতা। আমার অন্তরের এই কথাগুলো মনে রেখো। সাধ্বী, সুন্দরী রমণী তোমার সন্তানের জননী হবে। আমি তাদের দেখবো; তোমার পত্নী কিন্তু কখনো হব না,—জননী হবার আনন্দও আমার অদৃষ্টে নেই। আমি যে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার নিদর্শন, প্রিয়তম!—একটা মায়া, একটা স্বপ্ন;—উল্কার মতো ক্ষণেকের তরে তোমার জীবনের মাঝ দিয়ে ছুটেছি। এর পরে হয় ত আরো বেশি কিছু হতে পারব, কিন্তু পত্নী হতে কখনো পারব না;—এ জন্মে না, পর জন্মেও না।"

তারপর হঠাৎ একদিন কিমিকো অদৃশ্য হইল। কেন গেল, কোথায় গেল, কখনই বা গেল—কেহ জানিল না।

(৪)

বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, রাশি রাশি উপহার কিছুই কিমিকো সঙ্গে লয় নাই। তাই লোকে ভাবিল, আবার সে ফিরিবে। কিন্তু যখন কয়েক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, অথচ কিমিকোর কোন সন্ধানই মিলিল না, তখন মনে হইল, বুঝি বা সে কোন আকস্মিক বিপদে পড়িয়াছে। নদীতে টানা জাল দেওয়া হইল, কূপ মধ্যে ডুবুরি নামানো হইল, পত্র এবং টেলিগ্রাফ দ্বারা সন্ধান লওয়া হইল, কত বিশ্বস্ত অনুচর চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাসের পর মাস করিয়া শেষে বৎসরও অতিবাহিত হইল, কিন্তু সেই সুন্দরী নর্ত্তকী আর ফিরিল না।

কিন্তু সে যা বলিয়াছিল তা সত্য হইল। সময়ে চোখের জল শুষ্ক হইল, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ লাভ করিল! কিমিকোর

'প্রিয়তম' আর একজনকে বিবাহ করিয়া একটি পুত্রলাভও করিল।

কথায় বলে, "পুরুষের হৃদয় যেন শরতের মেঘ!"

তারপর আরো কয়েক বৎসর অতীতের গর্ভে লীন হইল। সেই দেয়ালঘেরা পরী-রাজ্যে একদিন যেখানে কিমিকো ছিল, সেখানে অভাবের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

* * * *

তখন সবেমাত্র ধরণীর বুকে প্রভাতের আলো পড়িয়াছে। দ্বারে বুদ্ধের দাসী ভিখারিণী হাঁকিল "হা—ই"! "হা—ঈ"! শিশুটি সেই শব্দে ছুটিয়া বাহির হইল।

পরিচারিকা ভিক্ষা দিতে গিয়া দেখে ভিখারিণী শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তার কানে কানে কি বলিতেছে। পরক্ষণেই শিশু পরিচারিকাকে কহিল, "আমায় দিতে দাও।" ভিখারিণী মিনতির স্বরে কহিল, "দয়া করে

ওকেই দিতে দিন।" শিশু ভিখারিণীর ঝুলিতে চাল ঢালিয়া দিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভিখারিণী কহিল, "তোমার পূজনীয় পিতাকে যে কটি কথা বলবে, সেগুলি বল ত বাছা।" শিশু আধ আধ স্বরে কহিল, "যাকে তুমি এ জগতে কখনো দেখতে পাবে না, সে বলে গেছে, তোমার পুত্রকে দেখে সে বড় সুখী হয়েছে।"

ভিখারিণী মৃদু হাস্য করিল, ছেলেটিকে আর একবার কোলে তুলিয়া লইল, তারপর —চলিয়া গেল। পরিচারিকা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; পুত্র পিতার নিকট ছুটিল।

পুত্রের কথা শুনিয়া চোখের জলে পিতার বুক ভাসিয়া গেল। কারণ সে-ই জানে কে আসিয়াছিল, সে-ই বোঝে সে ত্যাগের মহিমা!

তাই সে আজকাল কেবল ভাবে, কিন্তু ভাবনার কথা মুখ খুলিয়া কাহাকেও বলে না।

সে জানে, সেই রমণীরত্ন, যে তাহাকে ভালবাসিত, তার ও নিজের মধ্যে অসীম ব্যবধান। গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যে ব্যবধান, সে ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশী! কোন্ সুদূর নগরে, কোন্ নামহীন রহস্যময় অপ্রশস্ত গলিঘুঁজির গোলকধাঁধার মধ্যে, কোন্ অজানিত ক্ষুদ্র মন্দিরে সে ভগবান বুদ্ধের চরণ লাভের জন্য মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে—তা জানিতে ইচ্ছা করা বিড়ম্বনা, তা সে বেশ বুঝে। সে যেন দেখিতে পায়, বুদ্ধ তাঁর শান্ত হাস্যোদ্ভাসিত মুখ নর্ত্তকীর দিকে ফিরাইয়া মধুর স্বরে কহিতেছেন, "হে আমার কন্যা! তুমি শ্রেষ্ঠ পথ অনুসরণ করিয়াছ; তুমি সার সত্য বুঝিয়াছ ও তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছ। তাই আমি তোমায় আহ্বান করিতে আসিয়াছি।"

সে কণ্ঠস্বর মানব প্রেমিকার কণ্ঠস্বরের চেয়েও কত মধুর!

মাৎস্ুয়্যামা দর্পণ

অনেক দিন আগে এক নিভৃত স্থানে এক যুবক ও তাঁহার পত্নী বাস করিতেন। তাঁহাদের একটি মাত্র সন্তান, ছোট একটি মেয়ে; উভয়েই সন্তানটিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। দম্পতীর নাম জানি না, কারণ অনেক দিন আগে লোকে তাঁহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু যে স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন সে স্থানটির নাম মাৎস্ুয়্যামা, এচিঙো প্রদেশের অন্তর্গত।

ছোট মেয়েটি যখন নিতান্ত শিশু, তখন কার্য্যগতিকে একবার তাহার পিতাকে বিরাট সহর, জাপানের রাজধানীতে যাইতে হয়। অনেক দূরে রাজধানী, শিশুর মাতা ও শিশুর যাওয়া কষ্টকর, সে জন্য পিতা একাকী

যাত্রা করিলেন। পত্নী ও সন্তানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, ফিরিবার সময় ভাল ভাল উপহার লইয়া আসিবেন।

শিশুর মাতা পরবর্ত্তী গ্রামের ওপারে কখনো পদার্পণ করেন নাই, তাই স্বভাবতই পতি এত দূরদেশে গমন করাতে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; তবুও তাঁহার পতিই সর্ব্বপ্রথম সেই গ্রাম হইতে রাজধানীতে—যেখানে সম্রাট তাঁহার বড় বড় ওমরাহদের সঙ্গে থাকেন এবং যেখানে সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য দর্শনীয় পদার্থ অনেক, সেখানে—গমন করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিলেন।

অবশেষে পতির প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল। শিশুটিকে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, এবং নিজে পতির প্রিয় একটি নীল রঙের পোষাক পরিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনুরক্তা পত্নী স্বামীকে সুস্থশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন, এবং ছোট মেয়েটি পিতার আনীত সুন্দর খেলনা দেখিয়া কেমন আনন্দে হাততালি দিয়া হাস্য করিতে লাগিল! পথে এবং সহরে পিতা যে সব আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছিলেন তাহার অনেক গল্প হইল।

"তোমার জন্যে একটি ভারি সুন্দর জিনিষ এনেচি, এর নাম দর্পণ। দেখ ভিতরে কি আছে দেখ", এই কথা বলিয়া তিনি পত্নীকে একটি সাধারণ কাষ্ঠনির্ম্মিত শ্বেত রঙের বাক্স দিলেন। বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর পত্নী একখণ্ড গোলাকার ধাতু দেখিতে পাইলেন। তাহার এক দিক ঘনীভূত রৌপ্যের মতো শুভ্র এবং পক্ষী ও পুষ্পের উত্থিত ছবির দ্বারা সজ্জিত; অন্যদিক অতি স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ উজ্জ্বল। যুবতী মাতা সবিস্ময় আনন্দের সহিত ইহা

দেখিতে লাগিলেন, কারণ ইহার মধ্য হইতে তাঁহার দিকে একখানি উজ্জ্বলচক্ষুবিশিষ্ট, বিস্ময়পুলকিত মুখ উঁকি মারিতেছিল। পত্নীর বিস্ময়ে, এবং বিদেশ হইতে নূতন কিছু শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন দেখাইতে পারিয়া আনন্দিত চিত্তে যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌চ অ্যাঁ?"

"এক সুন্দরী রমণী আমার দিকে দেখ্‌চে, তার অধর কম্পিত হচ্চে, যেন সে কিছু বল্‌ছে, আর, কি আশ্চর্য্য, সেও আমার মতো অবিকল একটি নীল পরিচ্ছদে সজ্জিত!"

পত্নী যে বিষয় জানেন না তাহা জানার ঈষৎ গর্ব্বের সহিত স্বামী উত্তর করিলেন, "পাগ্‌লি! তা নয়, তা নয়, তোমার মুখই তুমি দেখতে পাচ্চ। গোলাকার ধাতুটির নাম দর্পণ, আমরা এ গ্রামে ইহার পূর্ব্বে কখনো এমন জিনিষ না দেখলেও, সহরের প্রত্যেকের কাছেই এরকম এক একখানি আছে।"

পত্নী এই উপহার পাইয়া মোহিত হইয়া গেলেন। প্রথম কয়দিন দর্পণখানি ঘন ঘন দেখিতেন, দর্পণের মধ্যে আপনার সুন্দর মুখখানির প্রতিবিম্বের সহিত এই যে তাঁহার প্রথম পরিচয়! কিন্তু একদিন তাঁহার মনে হইল এমন আশ্চর্য্য অমূল্য নিধি প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য নয়। দর্পণখানি তাঁহার বাক্সের মধ্যে বহুমূল্য সম্পত্তির সঙ্গে সযত্নে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, দম্পতী সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবনের আনন্দ, সেই ছোট মেয়েটি; সে তাহার মাতার প্রতিকৃতিরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্নেহ-শীলতায় প্রত্যেকেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল। আপনাকে সুন্দরী দেখিয়া তাঁহার নিজের মনে ক্ষণিক অহঙ্কার উদয় হইয়াছিল, এই কথা স্মরণ করিয়া, পাছে দর্পণে রূপচ্ছবি দেখিয়া

কন্যার মনেও অহঙ্কারের উদয় হয়, এই ভয়ে মাতা আর্শিখানি সাবধানে লুকাইয়া রাখিলেন।

তিনি আর্শিখানির কথা কখনো উত্থাপন করিতেন না, পিতা ত সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মেয়েটি তাহার মাতার মতো নিজ সৌন্দর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়াই সরল আনন্দে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যে দর্পণ তাহার রূপের বিজলি চোখে হানিয়া তাহার সহিত তাহার নিজের পরিচয় করিয়া দিতে পারিত তাহার কথা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

সুখ চিরদিন সমান থাকে না। কালক্রমে এই সুখী পরিবারেও দুঃখের কালো ছায়া পড়িল। মাতা পীড়িতা হইলেন। কন্যা রাত্রিদিন মাতার সেবায় নিযুক্ত, তবুও দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, অবশেষে জীবনের আশা পর্য্যন্ত লোপ পাইল।

কন্যা ও স্বামীর নিকট হইতে চিরবিদায়ের সময় সন্নিকট জানিয়া, মাতা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "বাছা তুমি বোধ হয় বুঝতে পারচ আমার বড় অসুখ ; আমার মৃত্যু সন্নিকট, তোমাকে ও তোমার পিতাকে রেখে আমায় চলে যেতে হবে। আমার মৃত্যু হলে, প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুমি এই দর্পণের ভিতর দেখ্‌বে ; উহার মধ্যে তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাবে, এবং জেনো আমি তখনো তোমাদের দেখ্‌তে পাচ্চি।" এই কথা বলিয়া আর্শিখানি বাহির করিয়া কন্যাকে দিলেন। কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার আদেশ স্বীকার করিল। ইহার কিছুদিন পরেই মাতার নিরুদ্বেগ মৃত্যু হইল।

কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা মাতার অন্তিম অনুরোধ ভুলে নাই। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্য উদয়ের সময় ও সূর্য্যাস্তকালে আর্শিখানি

বাহির করিয়া একান্তমনে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখে। দর্পণের মধ্যে স্বর্গীয়া মাতার হাস্যোজ্জ্বল ছায়া দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এ শেষ-জীবনের রুগ্না বিবর্ণা মাতা নয়; বহু পূর্ব্বের সুন্দরী যুবতী মাতা, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে আনন্দে উল্লাসে নিটোল পরিপূর্ণ। তাঁহাকে সে প্রতি রাত্রে দিবসের দুঃখ কষ্টের কথা বলে, প্রভাতে তাঁহার নিকট সহানুভূতি ও উৎসাহের জন্য প্রাণের আঁচলখানি বিছাইয়া দেয়।

এইরূপে দিনের পর দিন সে যেন মাতার দৃষ্টির সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সুখী করিতে যেমন চেষ্টা করিত এখনো তেমনি করিতে লাগিল। তাঁহার মনে যাহাতে কষ্ট হইতে পারে এমন কিছুই করিত না। তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ছিল দর্পণখানির দিকে চাহিয়া বলিতে পারা "মা, তুমি আমাকে যেমন হইতে ইচ্ছা কর আজ আমি তেমনি হইয়াছি!"

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে আর্শির দিকে চাহিয়া কথা কহিতে দেখিয়া পিতা একদিন তাহাকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটি বলিল, "বাবা, আমি প্রতিদিন দর্পণের ভিতর মাকে দেখি ও তাঁর সঙ্গে কথা কই।" তারপর সে তাঁহাকে তাহার মাতার শেষ ইচ্ছার কথা বলিল, এবং সে যে কখনো তাহা ভুলে নাই তাহাও বলিল। কন্যার সরলতা ও একান্ত সস্নেহ আজ্ঞানু-বর্ত্তিতায় মুগ্ধ হইয়া পিতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আর্শির মধ্যে লক্ষিত ছায়া যে তাহার নিজেরই সুন্দর মুখ, যাহা প্রতিদিনের সহানুভূতি ও একাগ্র চিন্তায় তাহার স্বর্গীয়া মাতার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলিয়া কন্যার সরল বিশ্বাসে আঘাত করিতে তাঁহার মন উঠিলনা।

কূটবুদ্ধি

কোন্দো সামুরাই। সে যে তরবারি-চালনে সুদক্ষ এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে সে চিত্রবিদ্যাটাও এতদূর আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তার নাম কিয়োতো রাজসভার আমীর-ওমরার কানে পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল।

যোগুণ ইয়েমিৎসুর সহিত এক রাজকুমারীর বিবাহ স্থির হইল। এবং ইহাও স্থির হইল যে, সেই বিবাহে ভাবী বধুকে একখানি রেশমী পরদা উপহার দেওয়া হইবে। যোগুণের প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ হইল যে, তিনি যেন সেই পরদার উপর কোন্দোকে দিয়া কিওতোর নিকটবর্ত্তী 'বিওয়া' হ্রদের আটটি সুবিখ্যাত দৃশ্য অঙ্কিত করাইয়া লন।

প্রধান মন্ত্রীটি কিন্তু জনপ্রিয় ছিলেননা।

তিনি একটি ছোটখাটো নবাব। তাই তিনি যখন কোন্দোর নিকট কথাটা পাড়িলেন, তখন সে যথেষ্ট বিনয় ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে এ কার্য্য করিতে পারিবে না। সে সামুরাই, এবং সেই হেতু যোগুণের জন্য যে-কোনো মুহূর্ত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু চিত্রাঙ্কন! সে বিষয়ে সে কারো হুকুম মানিবে না, এমন কি মহামান্য প্রধান সচিবেরও না।

মন্ত্রী ত কথাটা শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেলেন। তিনি যে রাজকুমারীর পিতাকে কথা দিয়াছেন যে পর্দাখানি নিশ্চয়ই পাঠাই-বেন; এখন—কেমন করিয়া তাঁর কাছে মুখ দেখান!

বিপদে পড়িয়া তাঁর ওকুবোর নাম মনে পড়িয়া গেল। যোগুণের কার্য্যে সে চুল পাকাইয়াছে, পেঁচালো বুদ্ধিতেও তার সমকক্ষ কেহ নাই এইরূপই লোকে বলিয়া থাকে।

তার শরণাপন্ন হইতে হইবে! সে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে!

পর দিন প্রভাতে ওকুবো একটিও অনুচর সঙ্গে না লইয়া একেবারে কোন্দোর বাড়ীতে গিয়া হাজির। এরূপ প্রথাবিরুদ্ধ কার্য্যে কোন্দো বিস্মিত হইল; প্রবীণ আগন্তুককে সে সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর প্রসঙ্গক্রমে ওকুবো কলাবিদ্যার কথা পাড়িল। এ বিদ্যায় কোন্দোর পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া কহিল :—

"তোমার গুরু কানো তান্যু—তার কথা কে না শুনেচে! সে ওস্তাদ লোক ছিল। তুমি তার উপযুক্ত শিষ্য বটে। হায়, হায়! আমার জীবনটা যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তেই কেটেচে; ললিতকলা চর্চ্চা কর্‌বার একটু অবসরও

মেলেনি। তোমরা শান্তির সময় জন্মেছ, তোমরাই সৌভাগ্যশালী!"

কোন্দো উত্তর দিল, "আপনার কথা শুনে অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে আমার লজ্জা হচ্ছে। সামুরাইয়ের তরবারি ধরাই উচিত, তুলি ধরা তার শোভা পায় না। কিন্তু কি করি, সময়টা ত কাটাতে হবে। তাই একটু একটু চিত্রচর্চ্চা করে থাকি। আমি কিন্তু কারো জন্যে ছবি আঁকি না—হাজার টাকা দিলেও না। এই সে দিন প্রধান মন্ত্রী রাজকুমারীর বিবাহে উপহার দেবার জন্যে বিওয়া হ্রদের দৃশ্য আঁকাতে এসেছিলেন। আমি তখনি জবাব দিয়ে দিলুম, আমা হতে এ কাজ হবে না। আমার রীতিই নয় পরের জন্যে ছবি আঁকা!"

ওকুবো ত কথা শুনে ভারী খুসী। বলিল "এই ত সামুরাইয়ের উপযুক্ত কথা!" কোন্দো বৃদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া মনে বেশ একটু আনন্দ

অনুভব করিল। তারপর ওকুবো একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "অনেক দিন হতে আমার একখানা পর্দা রয়েছে, ইচ্ছে করে কা'কেও দিয়ে কয়েকটা ছবি আঁকিয়ে নিই, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হয় না! বিখ্যাত চিত্রকর কা'কেও দিয়ে যে ছবি আঁকাব এমন সম্বল ত আমার নেই। তবে তুমি যদি অবসর মত পরদাখানার উপর দু'এক খানা ছবি এঁকে দাও তা হলে ..."

সামুরাই চিত্রকর ভাবিল, "বৃদ্ধ কেমন বিনয়ী, কেমন সজ্জন! এ লোকটি 'দাইম্যো' হইবার উপযুক্ত কিন্তু কি দুঃখের কথা! এক-খানা সামান্য পর্দা অঙ্কিত করাইতে পারে না!"

সামুরাইয়ের নরম ভাব দেখিয়া ওকুবো কহিল, "আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তোমার ঐ যে ললিতকলা চর্চ্চার জন্যে অর্থ গ্রহণে অনিচ্ছা—

এ আমার বড় ভাল লাগে। আমার বাড়ীতে একটী পাঁচরঙা আইভি লতা আছে, সারা জাপান খুঁজলেও এমন লতা আর একটি মিল্‌বে না। লতাটি ওলন্দাজেরা যোগুণকে দিয়েছিল, এমন লতা কোনো 'দাইম্যো' কথনো চক্ষে দেখে নি! এই অপূর্ব্ব লতাটি যোগুণ আমাকে দিয়েছিলেন। যদি আমার পর্দ্দার উপর কিছু এঁকে দাও ত আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই লতাটি তোমাকে দিই। অবশ্য তোমার গুণের পুরস্কার দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ...”

এই অদ্ভুত লতার বিবরণ শুনিয়া কোন্দোর লোভ হইল; ছবি আঁকিয়া দিতে আর আপত্তি রহিল না। ওকুবো কহিল, “যদি কষ্ট ক'রে ছবিই আঁকবে, তা হলে বিওয়া হ্রদের দৃশ্যগুলিই এঁকে দাও না! যে ছবি প্রধান সচিব পান নি, সে ছবি আমি পেলে আমার কত আনন্দ! আর

এইরূপে প্রধান মন্ত্রীকে খুব অপদস্থও করা হবে।"

কোন্দো ভাবিল, "কথাটা ঠিক! মন্ত্রী বেটা খুব জব্দ হবে!"

ছবিখানি যে দিন ওকুবোর বাড়ী পৌঁছিল, সেই দিনই পাঁচরঙা আইভি লতা কোন্দোর বৈঠকখানার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

লতাটি পাইয়া কোন্দো আনন্দে আটখানা! সে তার বন্ধুবান্ধবকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। সকলেই লতাটি দেখিয়া কোন্দোর সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ষোগুণের নিজস্ব সম্পত্তি কোন্দোর হস্তে আসিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! বন্ধুগণ যখন বিদায় লইতেছেন তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "ওহে পাতার রং যেন 'ঝুটো' বলে বোধ হচ্ছে! পাতাগুলো রং করা নাকি?"

কোন্দো অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "ক্ষেপেছ!"

কিন্তু যখন জল দিতে বাস্তবিকই রং ধুইয়া গেল, তখন কোন্দো রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তাহাকে ঠকানো হইয়াছে, অপমান করা হইয়াছে! এ অপমানের ক্ষমা নাই! ওকুবোর রক্তে সে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তরবারি গ্রহণ করিল, এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ওকুবোর সন্ধানে ছুটিল।

কোন্দোর আহ্বান শুনিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ওকুবো বাহিরে আসিল। যেন নিতান্ত ভাল মানুষ! পরিধানে তার ষোগুণদত্ত রেশমী পোষাক; পোষাকের উপর ষোগুণের কুল-চিহ্ন অঙ্কিত। মুখে তার ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। সামুরাই-শার্দ্দূলের সামনে সে গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইল।

"অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্যে

তোমার শ্বেত মস্তক ও লম্বা দাড়ি নিতে এসেছি" বলিয়া কোন্দো ক্ষিপ্রগতিতে তরবারি চালাইল। কিন্তু ওকুবো তার অভিপ্রায় বুঝিয়া সরিয়া গিয়াছিল, তরবারির আঘাত তাহাকে লাগিল না।

ওকুবো উচ্চকণ্ঠে কহিল, "মূর্খ কোথাকার! দেখছিস্ না আমার পরিচ্ছদের উপর যোগুণের কুলচিহ্ন। এ পরিচ্ছদের উপর তরবারি চালালে যোগুণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করবার দণ্ডভোগ করতে হবে। তুই রাজদ্রোহীর শাস্তি পাবি।"

কোন্দোর তখন চৈতন্য হইল, সে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিল, এবং আর একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে প্রস্তুত, তাহাও কহিল।

ওকুবো উত্তর দিল, "তার প্রয়োজন নেই। তুমি যে ছবি এঁকে দিয়েছিলে তা যথাসময়ে প্রধান সচিবকে পাঠান হয়েছে। আর অর্থ

গ্রহণ করে ছবি আঁকা তোমার রীতি নয় ব'লে ছবির মূল্য স্বরূপ যে এক হাজার রেয়া পেয়েছিলুম তা আমিই গ্রহণ করেচি। কি আর করি বল, তোমায় সে টাকা দিয়ে তোমাকে অপমান করতে ত আর পারি না!"

হারু

তার শিক্ষা পুরাণো প্রথা অনুসারে প্রধানত গৃহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই গৃহ-শিক্ষা হৃদয়ের সারল্য,হাবভাবের সহজ মাধুর্য্য, বাধ্যতা ও কর্ত্তব্যানুরাগ এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিত যা জাপান ছাড়া অন্যত্র কোথাও সম্ভব নয়। এরূপ শিক্ষাসৃষ্ট জীব বড় কোমল বড় মধুর ; তাহা আজিকার কঠোর সময়ের উপ-যোগী না হইলেও পুরাণো জাপানী সমাজের যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল, এ কথা বলা যায় না। শিক্ষিতা রমণীকে এক কথায় স্বামীর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। সে যেন কখনো ঈর্ষা, দুঃখ বা ক্রোধের বশবর্ত্তী না হয় এই শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হইত। রমণী নিজের মধুর স্বভাব দিয়া

স্বামীর কুপ্রবৃত্তি দমন করিবে, ইহাই সকলে আশা করিত। এক কথায় তাহাকে অতি-মানুষিক হইতে হইত,—অন্তত বাহিরে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাব দেখাইতে হইত। এরূপ করা সম্ভব কেবল সেই স্বামীর সঙ্গে, যে পদমর্য্যাদায় তার স্ত্রীর সমান ও সূক্ষ্মদর্শী; যে তার মন বোঝে এবং কখনো সে মনে আঘাত করে না।

হারু যে পরিবার হইতে আসিয়াছিল তা তার স্বামীর পরিবার অপেক্ষা অনেক ভাল। সেই কারণে বোধ হয় তার স্বামী তাকে ভালরকম বুঝিত না। অতি অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ হয়। হারুর স্বামীটির বিষয়বুদ্ধি বেশ পাকা ছিল, তাই দরিদ্রতার সঙ্গে যুঝাযুঝি করিয়া অল্পকালের মধ্যেই অবস্থা স্বচ্ছল করিয়া তুলিল। হারুর কিন্তু কখনো কখনো মনে হইত, দরিদ্র অবস্থাই ছিল ভাল তখনই তাহার পতি তাহাকে

ভালবাসা দিতে কখনো কার্পণ্য করেন নাই!

সে তখনো নিজেই তার পোষাক তৈয়ারি করিত; আর স্বামী তার সূচিকার্য্যের প্রশংসা করিত। সে স্বামীর পোষাক পরিবার ও ছাড়িবার সময় স্বামীকে সাহায্য করিত; তাদের সুন্দর বাড়ীটিতে স্বামীর সর্ব্ববিষয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত; প্রাতঃকালে কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় তাহাকে মধুরকণ্ঠে বিদায় দিত, আবার ফিরিয়া আসিলে স্বাগত সম্ভাষণ করিত; স্বামীর বন্ধুগণকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিত, যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে সংসার চালাইত এবং মুখ খুলিয়া কখনো কিছু চাহিত না। চাহিবার কোনো প্রয়োজনও ছিল না, স্বামী তাকে সকল জিনিষই দিত। সুসজ্জিতা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটারে ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের জায়গায় যাইত। বসন্তের

'সাকুরা', গ্রীষ্মরাত্রে খদ্যোতের ঝিকিমিকি বা শরতের রক্তবর্ণ 'মেপল্'এর জন্য প্রসিদ্ধ সকল স্থানে যাইত। কখনো বা 'মাইকো'তে * সমুদ্রের ধারে—দেবদারু গাছগুলো যেখানে নর্তকীর মতো হেলিয়া পড়ে,—একত্রে বেলা কাটাইত; বৈকাল বেলাটা কোনোদিন বা বহু পুরাতন এক গ্রীষ্মাবাসে কাটিত; সেখানে সব জিনিষই যেন যুগযুগান্তের স্বপ্ন দিয়া ঘেরা; ঘন বন সেখানে প্রচুর ছায়া বিস্তার করিতেছে, স্বচ্ছ শীতল জল নির্ঝর হইতে গহ্বরাভ্যন্তরে উছলিয়া পড়িয়া কলতান তুলিয়াছে ও কোন্ সুদূরের বাঁশীর সুর অনুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এই সব ছোটখাটো আমোদ ও ভ্রমণের জন্য ছাড়া হারু কখনো বাহিরে যাইত না। তার এবং তার স্বামীর আত্মীয় কুটুম্বেরা

---

* রাজধানী।

সকলেই দূরদেশে থাকিতেন। সেই জন্য কারো বাড়ীতে যাওয়ার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। বাড়ীতে থাকিয়া সে ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিত, ঘরগুলি গুছাইত, উদ্যানের পুষ্করিণীর লাল মাছগুলিকে স্বহস্তে খাওয়াইত। মাছগুলিও তাহাকে এমনি চিনিয়াছিল যে তাহাকে আসিতে দেখিলেই মাথা উঁচু করিয়া ভাসিয়া উঠিত, আনন্দে ল্যাজ খেলাইয়া নিকটে আসিত।

এ পর্য্যন্ত কোনো সন্তান জন্মিয়া তার জীবনে নূতন সুখ বা দুঃখ আনে নাই। মাথায় তার বিবাহিতা রমণীর খোঁপা থাকিলেও তাহাকে নিতান্ত অল্পবয়স্কার মতো দেখাইত।

ঘরকন্নার ছোট ছোট কাজে পত্নীর দক্ষতা ছিল বলিয়া বড় কাজেও স্বামী তার পরামর্শ চাহিত—ত[illegible] সে শিশুর মতো সরল ছিল। পাঁচ বৎসর সে স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া বেশ

সুখেই কাটাইয়াছে। স্বামীও পত্নীর সহিত এতদিন ধরিয়া যথাসম্ভব সদয় ব্যবহারই করিয়া আসিতেছে।

সহসা তার ব্যবহার কেমন উদাসীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া হারু তার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে নিশ্চয় তার কোনো কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে। সে তার নিরীহ মনকে তোলাপাড়া করিয়া তুলিল ও স্বামীর সন্তোষ সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। স্বামী তাহাকে কোনো কঠোর কথা বলিত না, কিন্তু সে সেই তুষ্ণীম্ভাবের পশ্চাতে অনুচ্চারিত কথাগুলো বলিবার ইচ্ছাটা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইত। উচ্চশ্রেণীর জাপানীরা স্ত্রীর প্রতি বাক্যে রূঢ়তা প্রকাশ প্রায়ই করে না। কিন্তু এমন কিছু আছে যা সকল বাক্যের চেয়েও নিষ্ঠুর—অবহেলা; যে

অবহেলা ঈর্ষ্যা উদ্রেক করে। সত্য বটে কিছুতেই ঈর্ষান্বিতা না হইতে জাপানী স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু এ মনোবৃত্তিটা সকল শিক্ষার চেয়েও পুরাতন,—প্রেমের মতো পুরাণো; এবং প্রেমের মতোই চিরস্থায়ী।

হারুর ঈর্ষ্যার কারণ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সে বড়ই শিশুভাবাপন্না তাই কিছু বুঝিত না। পরিচারিকারাও স্নেহবশত তার কাছে এ বিষয়ের কোনো আলোচনা করিত না। তার স্বামী ত আগে আগে সন্ধ্যা বেলাটা গৃহমধ্যে বা অন্য কোথাও তারই সঙ্গে কাটাইত কিন্তু এখন সে একাকী যায় কোথা? প্রথমবারে সে বলিয়াছিল, 'কাজ আছে'; কিন্তু তারপর সে আর কোনো কারণই দেখাইত না, এমন কি কখন ফিরিবে তাহাও বলিয়া যাইত না। সে কেমন যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল; পরিচারিকারা বলাবলি করিত, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে।

আসল কথা, কৌশলে তাহাকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং তাহাতে সে ধরাও পড়িয়াছিল। 'গেইষা'র * একটা গোপন কথা তার চিত্ত অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে; একটা বিলোল কটাক্ষ, একটু-খানি হাসি তার চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে। মাকড়সা যেমন শীকার ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করে, সেও তেমনি ভোগের মায়াজাল বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। সে জালে পড়িলে দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষের আর নিস্তার ছিল না!

হারু এসব কিছুই জানিত না। কিন্তু ক্রমে স্বামীর আশ্চর্য্য ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হইল, অর্থগুলোও আর বাড়ীতে আসে না। সন্ধ্যাবেলায় স্বামীর দেখা পাওয়া ভার, কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা

---

* নর্ত্তকী।

করিতেও সাহস হয় না, তিনি যদি কিছু মনে করেন! তাই মনে যে ভাব আসিত বাক্যে তা প্রকাশ না করিয়া সে একান্তমনে স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত। বুদ্ধিমান স্বামী হইলে পত্নীর মনের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইত না, কিন্তু হারুর স্বামীর ব্যবসায়বুদ্ধি বেশ পাকা হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধি খুব অল্পই ছিল। সন্ধ্যাবেলাটা সে বাহিরেই কাটাইতে লাগিল এবং ক্রমশ চিত্ত যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল বাড়ী হইতে অনুপস্থিতির কালটাও তত দীর্ঘ হইয়া পড়িতে লাগিল। যত রাত্রিই হউক না কেন, স্বামীর গৃহে না ফেরা পর্য্যন্ত সাধ্বী পত্নী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে, এই শিক্ষাই হারু পাইয়া আসিয়াছে, তাই অনিদ্রায় একলাটি বসিয়া বসিয়া তাহার স্নায়বিক পীড়া জন্মিল; দিনে দিনে জাগরণক্লান্ত চক্ষু দুটি জ্যোতিহীন ও স্নিগ্ধকোমল মুখখানি মলিন হইতে লাগিল। একদিন কেবল

অনেক রাত্রে ফিরিয়া স্বামী বলিয়াছিল, "এত রাত পর্য্যন্ত কেন বসেছিলে? আর কখনো এমন করো না।" হারু সে দিন মনে করিয়াছিল, বুঝি বা স্বামী তার জন্য মনে ব্যথা পাইয়াছেন, তাই সে সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, আমার ঘুম পায় নি, ক্লান্তিও বোধ হয় নি, আমার জন্যে চিন্তিত হবেন না!" এ কথা শুনিয়া স্বামী মনে মনে প্রীত হইল এবং সেই দিন হইতে পত্নীর বিষয় চিন্তা করা একেবারে ছাড়িয়া দিল।

ইহার কিছু দিন পরে একদিন সারা রাত সে গৃহে ফিরিল না। তার পররাত্রেও সে ফিরিল না, তার পররাত্রেও না। তৃতীয় রাত্রের পর সে প্রাতে আহারের জন্যও বাড়ী ফিরিল না! আর চুপ করিয়া থাকা নয়, এইবার হারু স্বামীর সহিত একটা বোঝা-পড়া করিবেই করিবে! তার কিছুই আর

অগোচর নাই, পরিচারিকারা তাহাকে কিছু কিছু বলিয়াছে, অবশিষ্ট সে বুঝিয়া লইয়াছে! সে যে কত পীড়িত সে তা নিজেই জানে না। সে কেবল বুঝিল হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এখনি যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইবে!

উৎসুক দৃষ্টি পথের উপর স্থাপন করিয়া সারা সকাল বেলাটা সে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। যেন একটি প্রস্তরমূর্ত্তি! চোখে জল নাই; প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির অচঞ্চল তার মুখও তেমনি স্তব্ধ গম্ভীর! আজ তার ভয়ভাবনার অন্ত নাই। সে কি সব গুছাইয়া বলিতে পারিবে! স্বামী যদি তার মনের ভাব বুঝিয়া ফেলেন! বুঝুন, ক্ষতি নাই; আর তো সহ্য হয় না! সে আর বাঁচিতে চাহে না! তার যে কেহ নাই, সে যে বড় দুঃখী! ভগবান তাহাকে মরণ দিন! আর কোনো প্রার্থনা নাই!

ঐ না কুরুমার চাকার শব্দ! ঐ ত ভৃত্যেরা বলিতেছে আসুন, আসুন! তার মাথা ঘুরিতেছে, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা অতি দ্রুত তালে দপ্ দপ্ করিতেছে চোখে সব জিনিষই কেমন ঝাপসা হইয়া উঠিল!

স্বামীর সহিত দেখা করিবার জন্য সে বহু কষ্টে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল। জ্বরে, বেদনায়, এবং পাছে সেই বেদনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেই ভয়ে তার ক্ষীণ তনু কম্পিত হইতেছে। লোকটা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কই, পত্নী তো তাহাকে সহাস্য বদনে স্বাগত সম্ভাষণ করিল না! সে তার কম্পমান ছোট হাত খানি দিয়া স্বামীর রেশমী জামার বুকটা চাপিয়া ধরিল। তার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত করিল, এই পাষাণের মধ্যে একটুখানি হৃদয়ের সন্ধান যদি মেলে! কি বলিতে গেল কিন্তু আর বলা হইল না; কেবল একটা কথা বাহির হইল

—তুমি? সেই মুহূর্ত্তে তার হাতের মুঠি শিথিল হইয়া গেল, কেমনধারা একটু হাসি চকিতের জন্য অধরে ভাসিয়া গেল, তারপর চোখ ছুটি মুদ্রিত হইল; তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবার পূর্ব্বেই সে পড়িয়া গেল। দেখা গেল সেই পতনে তার কোমল প্রাণের তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

স্বপ্ন

বাগানে ছিল একটা বহুদিনকার পুরাণো প্রকাণ্ড দেবদারু গাছ। গ্রীষ্মের অলস দিনে তার তলে বসিয়া আকিনোসুকে হাওয়া খাইত।

বৈকালে সে দিন বড় গুমট! তাই আকিনোসুকে তার দুই বন্ধু ও 'সাকে'র পেয়ালা লইয়া গাছের তলায় বসিয়া গিয়াছে। দু' এক পেয়ালা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ আকিনোসুকের চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল—সে গাছের তলায় মাটিতে শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া আকিনোসুকের হঠাৎ মনে হইল, নিকটবর্ত্তী এক পাহাড় হইতে যেন একটা মিছিল নামিতেছে। ভালো করিয়া

দেখিবার জন্য সে উঠিয়া বসিল। চমৎকার বিরাট মিছিল! ঠিক যেন কোনো সম্ভ্রান্ত 'দাইম্যো' যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন। এমন মিছিল সে জন্মে কখনো দেখে নাই! আবার একি! মিছিলটা যে তার-ই বাড়ীর দিকে আসিতেছে! মিছিলের পশ্চাতে সুন্দর-পোষাক-পরা এক দল যুবাপুরুষ এক-খানা রাজ-শকট টানিয়া আনিতেছে। গাড়ী-খানা মস্ত, গাড়ীর জানালা ও দরজায় উজ্জ্বল সবুজ রেসমী পর্দা। গাড়ীর গা হইতে গালার বার্ণিসের দীপ্তি চারি দিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। বাড়ীর নিকট আসিয়া মিছিল থামিল; জঁাকালোপোষাক-পরিহিত এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আকিনোসুকেকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল :—

"মহাশয়, আমি স্বর্গরাজের ভৃত্য। আমার প্রভু আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন এবং আপনার আজ্ঞা পালনের জন্যে আমাকে

পাঠিয়েছেন। তিনি রাজবাড়ীতে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন ও আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এই রাজ-শকট পাঠিয়েছেন, অনুগ্রহ করে গাড়ীতে উঠুন।"

কথাগুলি শুনিয়া একটা উপযুক্ত উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আকিনোস্থকে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, আর ঠিক সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তিও লোপ পাইল; তাই চুপ্-চাপ্ রাজভৃত্যের কথামত সে গাড়ীতে উঠিল; ভৃত্য তার পাশে বসিয়া চলিবার আদেশ দিল। যুবকেরা রেশমের দড়ি ধরিয়া গাড়ীখানা দক্ষিণ দিকে ঘুরাইল—যাত্রা স্বরু হইল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আকিনোস্থকে সবিস্ময়ে দেখিল, গাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড দোতালা ফটকের সামনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভৃত্য "আপনার পৌঁছান সংবাদ দিয়া আসি" বলিয়া অদৃশ্য হইল। কিছুক্ষণ পরে দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁদের

বেগুনে রঙের পোষাক ও মাথায় উঁচু টুপি। তাঁরা আকিনোস্থকেকে অভিবাদন করিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন ও পথ দেখাইয়া চলিলেন। সেই প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটা বিরাট উদ্যান পার হইয়া তাঁরা রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে উপস্থিত হইলেন। সে প্রবেশপথটি পূর্ব্বে পশ্চিমে কত দূর যে বিস্তৃত তার ঠিক নাই! তারপর তাঁরা যে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন সেটি যেমন প্রকাণ্ড তেমনি সুসজ্জিত। আকিনোস্থকেকে সম্মানের আসনে বসাইয়া পথপ্রদর্শক দু'জন সম্ভ্রমের সহিত দূরে সরিয়া বসিলেন। সুসজ্জিতা পরিচারিকারা জলখাবার লইয়া আসিল। জলযোগ শেষ হইলে সেই বেগুনে-পোষাক-পরিহিত লোকেরা অবনত হইয়া অভিবাদন করিলেন ও রাজসভার প্রথামত একের পর অন্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—

"এখন আমাদের কর্ত্তব্য আপনাকে বলা ....কেন আপনাকে এখানে আনা হই-য়াছে······আমাদের প্রভু মহামহিম রাজার ইচ্ছা যে, আপনি তাঁর জামাতা হন······এবং তাঁর ইচ্ছা এবং আজ্ঞা যে, অদ্যই আপনি বিবাহ করেন······মহামান্যা রাজকুমারী তাঁর কন্যাকে······আমরা অবিলম্বে আপনাকে রাজসন্নিধানে লইয়া যাইব······শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমার্ণব নৃপতি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন......কিন্তু প্রথমে আপনাকে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইতে হইবে।"

বক্তৃতার পর তাঁরা উভয়ে উঠিলেন, এবং সোনালি গালায় বার্ণিস করা একটি বৃহৎ দেরাজ খুলিলেন। দেরাজ হইতে নানা প্রকারের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও একটি রাজ-টুপি লইয়া আকিনোস্থকেকে রাজ-জামাতার উপযুক্ত সাজে সজ্জিত করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। গায়ে হল্‌দে রঙের রেশমী

পোষাক, মাথায় কালো রঙের উঁচু টুপি; দাইজা বা মহা-আসনের উপর রাজা বসিয়া আছেন। তাঁর বামে ও দক্ষিণে আমীর-ওমরাহের দল সার বাঁধিয়া মন্দিরমধ্যস্থ বিগ্রহ-মূর্ত্তির মতো স্থির নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তাঁদের মাঝ দিয়া অগ্রসর হইয়া আকিনোসুকে তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। তাহাকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিয়া রাজা কহিলেন—

"আমরা কেন তোমাকে আহ্বান করেছি তা তুমি শুনেছ। আমরা স্থির করেছি, তুমি আমাদের ঘরজামাই হবে। এইবার বিবাহ হউক।"

রাজার কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। একখানি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে রূপসী রমণীর দল আকিনো-সুকেকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

সুবৃহৎ ঘরটি আগন্তুকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেখানে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। রাজকন্যার সামনে নির্দ্দিষ্ট আসনে যখন আকিনোস্থকে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তখন উপস্থিত সকলে তাহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিল। স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরার মতো সে রাজকন্যা! তার অঙ্গে যে বসন তা গ্রীষ্মকালের আকাশের মতো অপরূপ সুন্দর!

বিবাহের পর প্রাসাদের অন্য দিকে তাহাদের জন্য যে ঘরগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়া আসিয়া নব দম্পতিকে অভিবাদন করিয়া গেল। উপহার যে কত আসিল তাহার আর সংখ্যা করা যায় না!

কিছু দিন পরে আবার রাজার নিকট হইতে আহ্বান আসিল। এবার রাজা অধিকতর স্নেহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন—

"আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাইমু দ্বীপ। আমরা তোমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলুম। সেখানকার লোকেরা বেশ রাজভক্ত ও শান্ত-স্বভাব; কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও শাসন-পদ্ধতি এখনো নিয়মিত হয় নি। তাদের করুণা ও বুদ্ধির সহিত শাসন করবে ও তাদের সামাজিক অবস্থা যাতে উন্নত হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হয়েছে।"

আকিনোসুকে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রাজদত্ত জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিল। অনুকূল বাতাস অবিলম্বে তাহাদিগকে দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল।

কমলার বরে দ্বীপটি ফল-পুষ্প-শস্যে ভরপুর। শান্তিপ্রিয় লোকগুলি স্বাস্থ্যসৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। বুদ্ধিমান মন্ত্রিবর্গের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়া, তাহাদের উৎসবাদিতে

যোগ দিয়া, আপনার জনের মতো তাহাদের সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়া আকিনোস্থকে সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল।

দীর্ঘ ত্রয়োবিংশতি বর্ষের মধ্যে তাহার জীবনে শোকের রেখা একটিও পড়ে নাই। কিন্তু পর বৎসর তাহার মাথায় বজ্রপাত হইল। পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মাতা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী ইহসংসার ছাড়িয়া গেল। হান্‌র‍্যোকো নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর তাহাকে মহা আড়ম্বরের সহিত সমাহিত করা হইল।

শোকার্ত্ত আকিনোস্থকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন গত হইলে এক দিন রাজদূত আসিয়া উপস্থিত। রাজা তাহার বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "তোমাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। তোমার পুত্রকন্যাগণের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা হইবে,

তাহাদের জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। রাজার নাতি-নাতিনীর মতোই তাহারা লালিত পালিত হইবে।"

রাজাজ্ঞা শুনিয়া বিনীত ভাবে সে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ ও কর্ম্মচারিবৃন্দের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজার প্রেরিত জাহাজে সে আরোহণ করিল। নীল আকাশের তলে, নীল জলের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। রাইবু দ্বীপটাও যেন নীল দেখাইতেছিল! তারপর সেটা ক্রমে ধূসর হইয়া আসিল, অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। আকিনোমুকে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল—তার বাগানের মধ্যে সেই দেবদারু গাছের তলায়!

কয়েক মুহূর্ত সে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিল, তার দুই বন্ধু পেয়ালায় চুমুক দিতেছে ও গল্প করিতেছে। তাহাদের

দিকে হতভম্বের মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"কী আশ্চর্য্য!"

তাহাদের মধ্যে এক জন হাসিয়া কহিল, "আকিনোসুকে দিনের বেলা স্বপ্ন দেখ্‌ছিল! আশ্চর্য্য কি দেখ্‌লে হে?"

আকিনোসুকে স্বপ্নটি বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া তাহার বন্ধুদ্বয়ও বিস্মিত হইল। সে ত এই কয়েক মিনিট মাত্র ঘুমাইয়াছে!

তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল—'আশ্চর্য্য বটে! তুমি যখন ঘুমুচ্ছিলে, আমরাও কিছু আশ্চর্য্য দেখেছি। ছোট একটি হল্‌দে প্রজাপতি তোমার মুখের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার পর তোমার পাশে গাছের কাছে বস্‌লো। যেমনি বসা, মস্ত এক পিঁপড়ে বেরিয়ে তাকে ধর্‌লে ও গর্ত্তের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। তোমার ওঠবার একটু আগেই সেই প্রজাপতি গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে তোমার মুখের উপর উড়্‌তে

লাগলো। তারপর হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল কিছুই বোঝা গেল না।"

অপর বন্ধু কহিল, "হয়ত সেটি আকিনোসুকের আত্মা। আমি যেন দেখলুম সে আকিনোসুকের মুখে ঢুকে গেল। কিন্তু প্রজাপতি যদি আকিনোসুকের আত্মাই হয়, তা হলেও ত স্বপ্নের কোনো মীমাংসা হয় না।"

প্রথম বন্ধু কহিল, "পিঁপড়েগুলো বোধ হয় কিছু সন্ধান দিতে পারে। অদ্ভুত জানোয়ার এরা—ভূত যে নয় তা-ই বা কে বলতে পারে! ... যাই হোক এই গাছতলায় পিঁপড়ের এক মস্ত বাসা আছে!"

আকিনোসুকে উত্তেজিত স্বরে কহিল, "এস, এস দেখা যাক!"

দেবদারু গাছের তলায়, গুঁড়ির চারি দিকে হাজার হাজার পিপীলিকা খড় কুটা ও কাদা দিয়ে ছোট ছোট 'নগর' তৈয়ারি করিয়াছে। একটা বড় গোছের 'নগরের'

চতুর্দ্দিকে গাদা গাদা পিপীলিকা জমা হইয়াছে। তাহাদের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড পিপীলিকা—তাহার ডানা হলুদ্‌বর্ণ ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ।

আকিনোসুকে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত আমার স্বপ্নের রাজা! আর ঐ ত তোকোয়ো রাজপ্রাসাদ! কী আশ্চর্য্য!... তা হলে রাইযু অবশ্য এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হবে...ঐ মোটা শিকড়টার বামদিকে হ্যাঁ, এই যে! ভারী আশ্চর্য্য! এইবার বোধ হয় হান্‌রেয়োকো পাহাড় ও আমার প্রিয়ার সমাধি পাওয়া যাবে।"

পিপীলিকার বাসা খুঁড়িয়া ফেলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটি ছোট্ট ঢিপি দেখা গেল। তার উপর একটি মসৃণ ছোট্ট পাথরের নুড়ি—বৌদ্ধ সমাধির উপর যেরূপ স্মরণ-প্রস্তর রক্ষিত হয় অনেকটা সেইরূপ। আর সেই নুড়ির তলে কাদার মধ্যে একটি স্ত্রী-পিপীলিকার মৃতদেহ!

চিত্রকর

(১)

পাহাড়ের উপর দিয়া কিওতো হইতে য়েদো যাইবার জন্য পদব্রজে সে যাত্রা করিয়াছিল। তখনকার দিনে রাস্তা সংখ্যাতেও যেমন অল্প ছিল, সেগুলির অবস্থাও তেমনি খারাপ। ভ্রমণ সমূহ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে "যতন করিলে রতন মিলে" যুবক চিত্রকর চিত্রের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছে।

একটা পাহাড় অতিক্রম করিয়া কোনো গ্রামে পৌঁছিবার চেষ্টায় সে পথ হারাইয়া ফেলিল।

আকাশে তখন চাঁদ ছিল না, দেবদারু গাছের ছায়াগুলো তাহার চতুর্দ্দিকে গাঢ়

অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানটা ভীষণ বন্য; গাছের পাতার মধ্য দিয়া বাতাসের সন্ সন্ শব্দ ও ঝিঁঝিঁ পোকার অফুরন্ত ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সে চলিল। হঠাৎ একটা পার্ব্বত্য নদীর সামনে আসিয়া পড়িল। নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইলে বোধহয় লোকালয় খুঁজিয়া পাইবে, এই আশায় কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখিল, নদীটা মহাকলরবে একটা গভীর খাতের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে।

নিকটস্থ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। যে দিকে চায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়! হতাশ হইয়া সে সে-রাত্রি মুক্ত আকাশতলে কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছে, এমন সময় সে যে-পাহাড় বহিয়া উপরে উঠিয়াছে তাহারি তলায় একটি ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইল। নিকটে গিয়া

দেখে এক ক্ষুদ্র কুটীরের রুদ্ধ দ্বারের ফাটলের মধ্য দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে। দেখিয়া বোধ হইল কৃষকের কুটীর। পুলকিতচিত্তে অগ্রসর হইয়া সে দ্বারে আঘাত করিল।

(২)

কয়েকবার আঘাতের পর ভিতর হইতে রমণী-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল "কি প্রয়োজন?" সে কী মধুর স্বর! আর এ যে রাজধানীর মার্জ্জিত ভাষা! যুবক আশ্চর্য্য হইল। সে উত্তর দিল, সে শিক্ষার্থী, পাহাড়ে পথ হারাইয়াছে; সে রাত্রের জন্য আহার ও বাসস্থান চায়, যদি অসুবিধা হয় ত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইবার পথ বলিয়া দিলে বড়ই বাধিত হইবে। ভিতর হইতে আরো কয়েকটি প্রশ্নের পর রমণী কহিল "আমি এখনি যাচ্ছি। আজ রাত্রে গ্রামে যাওয়া আপনার পক্ষে সহজ হবে না; পথেও বিপদ আপদ আছে।"

এইবার দ্বার খুলিল। রমণী একটা কাগজের লণ্ঠন লইয়া বাহিরে আসিল; নিজের মুখ যথাসম্ভব অন্ধকারে রাখিয়া যুবকের মুখ মনোযোগের সহিত দেখিল, তারপর তাহাকে হাতমুখ ধুইবার জন্য একটা পাত্রে কিছু জল ও একখানা তোয়ালে আনিয়া দিল। যুবক তাহার খড়ের চটি খুলিয়া ধূলি-ধূসরিত পদদ্বয় ধুইয়া ফেলিল। তারপর একটি ছোট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে তূলার আসনের উপর বসিয়া কয়লার আগুনে হাত গরম করিতে লাগিল।

এইবার সে গৃহকর্ত্রীকে ভালো করিয়া দেখিবার অবসর পাইল। তাহার বয়স তার চেয়েও দু একবৎসর বেশী হইতে পারে, কিন্তু তখনো তাহার পূর্ণযৌবন। তাহার অঙ্গের কমনীয়তা ও মুখের মাধুর্য্য দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। এ তো কখনো কৃষককন্যা নয়! পূর্ব্ববৎ অতি মধুর স্বরে সে কহিল, "আমি

এখানে একলা থাকি, এবং অতিথি কেউ আমার এখানে আসেনওনা। কিন্তু আজ রাত্রে আরো ভ্রমণ করা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। নিকটে কয়েকঘর কৃষকের বাস, আপনি কিন্তু একলা রাস্তা খুঁজে যেতে পারবেন না। সকাল পর্য্যন্ত এখানেই থাকুন। আপনার বিশেষ আরাম হবে না, কিন্তু আপনার শোবার বিছানা দোব। আপনি অবশ্য ক্ষুধার্ত্ত, আমার এখানে ভালো খাবার নেই, নিরামিষ আহার যা আছে তাই আপনাকে দোব।"

যুবতী তখন আগুন জ্বালিল, অনতিবিলম্বে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া যুবকের সামনে রাখিল। আহারের সময় সে দেখিল ছোট বাড়ীটি কি নিখুঁত পরিষ্কার, আহারের বাসনগুলি কেমন নিষ্কলঙ্ক! ঘরে অল্পসংখ্যক আসবাব সেগুলি মহার্ঘ না হইলেও কত সুন্দর! ঘরের একধারে একটি নীচু বেদী, তার উপর

বুৎসুদান, * তার গালা-করা ছোট দ্বারগুলি খোলা ; মধ্যে একখানি মৃতের নামলেখা কাষ্ঠ-ফলক, কয়েকটি বন্য ফুল ও একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। বুৎসুদানের উপরে "করুণা-দেবী"র একখানি অসাধারণ ছবি টাঙানো। দেবীর মস্তক চন্দ্র-পরিবেষ্টিত।

আহার শেষ হইলে রমণী কহিল, "আমার একটিমাত্র বিছানা ও একটি মশারি। আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ, ঘুমোবার সময় নেই। আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।" যুবক প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু রমণীর কথায় বোধ হইল, বাস্তবিকই তাহার কোনো বিশেষ কাজ আছে, তাহার বন্দোবস্তে কেহ আপত্তি করে ইহাও তাহার ইচ্ছা নয়। তাই সে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নীরব

* বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও পরিবারের মৃতব্যক্তির নামলেখা কাষ্ঠফলক রাখিবার ছোট আলমারি।

রহিল। রমণী বিছানা করিয়া দিল, বুৎসুদান ও বিছানার মাঝে একখানা পর্দ্দা টানিয়া দিয়া 'শুভ-রাত্রি' বলিয়া চলিয়া গেল। ক্লান্ত যুবক কাঠের বালিস মাথায় দিয়া অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত [illegible]ল।

কি একটা শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তাহার মনে হইল অধিকক্ষণ সে ঘুমায় নাই। শব্দটা পদশব্দ, তবে আস্তে আস্তে চলার শব্দ নয়। বরং দ্রুতপদ-বিক্ষেপের শব্দ, উত্তেজিত অবস্থায় চলার মতো। তাহার আশঙ্কা হইল, বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে। আশঙ্কা নিজের জন্য নয়, সে তো একপ্রকার নিঃসম্বল! তবে আশ্রয়-দাত্রী দয়াবতী রমণীর যদি কোনো বিপদ হয়! চেঁচাইয়া ডাকিবে না কি? না, তাহাতে অবস্থা আরো [illegible] হইতে পারে! যা থাকে কপালে, প্রাণ দিয়াও সে তাহার গৃহকর্ত্রীকে রক্ষা করিবে! তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া

মশারির বাহিরে আসিল; গুঁড়ি মারিয়া পর্দ্দার ধারে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

দীপালোকিত ধূপদানের সম্মুখে বিচিত্র-বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিতা যুবতী রমণী একাকিনী নৃত্য করিতেছে। পোষাকটী নর্ত্তকীর, তবে সে কখনো কোনো নর্ত্তকীকে এরূপ বহুমূল্য পোষাক পরিতে দেখে নাই। গভীর রাত্রে সেই নির্জ্জন স্থানে রমণীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া অলৌকিক বোধ হইতেছিল। নৃত্যটি যেন আরো অপূর্ব্ব! যুবক তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল; সে জীবনে এমন সুন্দর নৃত্য কখনো দেখে নাই। একবার তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি বা এ মানবী নয়, পরক্ষণে দেবতাসান্নিধ্যের কথা মনে পড়াতে নিজ দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইল। সে কিন্তু বুঝিল, রমণীর ইচ্ছা নয় যে সে এ দৃশ্য দেখে, এবং তাহারও কর্ত্তব্য নিঃশব্দে বিছানায়

গিয়া শুইয়া পড়া। কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তি ছিল না, যুবতীর রূপমাধুরী ও লাস্যলীলা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

হঠাৎ যুবতী স্পন্দিতবক্ষে থামিয়া গেল, কোমরবন্ধটি খুলিয়া ফেলিল ও উপরের পরিচ্ছদটি খুলিবার সময় পাশ ফিরিয়া যুবককে দেখিতে পাইয়া ভয়ানক চমকিয়া উঠিল।

যুবক তাড়াতাড়ি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কহিল, পদশব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া দেখিতে আসে— তাহার পর সে কহিল, "আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করবেন, কিন্তু আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কে, আর কেমন করেই বা এমন সুন্দর নৃত্য শিখলেন। আমি রাজধানীর সকল নর্ত্তকীর নৃত্য দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো নৃত্য করতে পারে এমন কাকেও দেখি নি।" রমণী ঈষৎ হাস্য

করিয়া কয়েকটা কথায় তাহার করুণ-সুন্দর জীবনের ইতিহাসটা বলিয়া ফেলিল।

সে রাজধানীর সর্ব্বাপেক্ষা নামজাদা নর্ত্তকী ছিল। যুবক বাল্যকালে তাহার নাম শুনিয়াছে। তাহার নামে যখন রাজধানী পাগল, তখন হঠাৎ একদিন সে অন্তর্হিত হইল। কেহ জানিল না, কেন গেল বা কোথায় গেল। সে যশ ছাড়িয়াছিল, অর্থ ছাড়িয়াছিল, সম্মান ছাড়িয়াছিল—প্রেমের জন্য। তাহার প্রিয়তমের অর্থ ছিল না কিন্তু তিনি তাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। রমণীও জীবন-যৌবন প্রাণমন সবই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিল। এই জনহীন নিভৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাহারা কয়েক বৎসর কি সুখে কাটাইয়াছে! প্রতি সন্ধ্যায় তাহার স্বামী বাজাইতেন, সে নৃত্য করিত। তাহার নৃত্য দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এক দীর্ঘ দারুণ শীতে

তিনি পীড়িত হইলেন, সে কত সেবা করিল, প্রাণপণ যত্নে ; কিছুতেই কিছু হইল না, তাঁহার মৃত্যু হইল। সেই অবধি সে তাঁহার স্মৃতি বুকে ধরিয়া একাকিনী এইখানে আছে। তাঁহার আত্মার প্রীতির জন্য প্রতি রাত্রে সেই আগেকার মতো নৃত্য করে, ঐ বুৎসুদানের সম্মুখে ; সেখানে যে তার স্বামীর নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলক রক্ষিত আছে !

সুনিদ্রার পর প্রভাতে যখন যুবক উঠিল, বেলা তখন অনেক হইয়াছে। দেখিল, রমণী তাহার জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। আহার সারিয়া বিদায়ের সময় সে যখন রমণীকে মূল্য দিতে গেল, সে তাহা গ্রহণ করিল না, কহিল, "আমি যা দিয়েছি, তার আবার মূল্য কি ? আপনি যে সব অসুবিধে ভোগ করলেন, অনুগ্রহ করে তা ভুলে গিয়ে কেবল আমার যত্ন করবার ইচ্ছাটা মনে রাখবেন।"

(৪)

কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের রীতিনীতিও কতক কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্রকর এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত। কিন্তু সে এখন অখ্যাত দরিদ্র নয়। বড় বড় রাজা মহারাজা, আমীর ওমরাহ্ তাহার চিত্রাঙ্কণে মুগ্ধ; তাহার নাম দেশে কে না জানে? রাজধানীতে তাহার প্রাসাদতুল্য বাড়ী; সে বাড়ীতে থাকিয়া কত যুবক তাহার কাছে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা শিখিতেছে।

একদিন দ্বারবানেরা আসিয়া কহিল, "একটা বুড়ী, বোধ হয় ভিখিরী, আপনার খোঁজে ক দিন থেকে আসছে। সে বলে প্রভুর সঙ্গে তার কাজ; আমরা কত বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি কিন্তু সে আবার এসেছে।"

বৃদ্ধ-চিত্রকর ভৃত্যাদিগকে ভর্ৎসনা করিল, কেন তাহারা এ কথা পূর্ব্বে বলে নাই? সে

যে এককালে দরিদ্র ছিল, এ কথা বৃদ্ধ ভুলে নাই। নিজে ফটকের কাছে গিয়া সস্নেহে মলিনবেশধারিণী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি চায়? সে বলিল, সে অর্থও চায় না, আহারও চায় না—চিত্রকর অনুগ্রহ করিয়া তাহার একখানা ছবি আঁকিয়া দিলে সে কৃতার্থ হইবে!

চিত্রকর তাহার ইচ্ছা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে ভিতরে আসিতে কহিল। ভিতরে আসিয়া বৃদ্ধা হস্তস্থিত পুঁটুলিটি খুলিল, কম্পিতহস্তে সেকালের নর্ত্তকীর পোষাক এক একখানি করিয়া বাহির করিতে লাগিল। সেগুলি রেশমী, তার উপর সোনালিকাজ করা; ব্যবহারে মলিন হইয়া গিয়াছে, তবু সেগুলি বহুমূল্য।

সেগুলি দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ চিত্রকরের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল! সে দেখিল, বিজন পার্ব্বত্য

প্রদেশে সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, সে পথহারা হইয়া ঘুরিতেছে ;—সে দেখিল বিজনবাসিনীর ছোট সেই শয়নের ঘর, বুৎসুদানের সম্মুখে সেই ক্ষীণালোক, মধ্যরাত্রে একাকিনী যে নৃত্য করিতেছিল তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। তখন সেই রাজারাজড়ার বন্ধু বৃদ্ধ চিত্রকর সেই বৃদ্ধাকে নত হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আমাকে মার্জ্জনা করুন, আপনার মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্যে চিনতে পারি নি ; কিন্তু আপনার সঙ্গে একরাত্রির সাক্ষাতের পর কত বৎসর অতীত হয়ে গেছে। আমার সব মনে পড়েচে। আপনার একমাত্র বিছানা আমাকে শোবার জন্যে দিয়েছিলেন। আপনি আমাকে আপনার ইতিহাস বলেছিলেন, আপনার নৃত্য দেখবার সৌভাগ্যও আমার ঘটেছিল। আপনার নাম আমি ভুলি নি।"

চিত্রকরের মুখে নিজ নাম শুনিয়া বৃদ্ধা

অবাক হইয়া গেল। ইদানীং তাহার স্মরণ-শক্তি কমিয়া আসিতেছে, সে জীবনে কষ্টও পাইয়াছে অনেক। চিত্রকর সস্নেহে তাহাকে অনেক কথা বলিল, রমণীর চোখে আনন্দাশ্রু বহিল। সে তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ সে দরিদ্র হইয়া পড়ে, তারপর বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া এই রাজধানীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে এখন তাহাকে কেহই জানে না ; কিন্তু তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, দুঃখ কেবল যে, সে এখন বড় দুর্ব্বল, আর সে প্রিয়তমের মনোরঞ্জনার্থ বুৎসুদানের সামনে নৃত্য করিতে পারে না! তাই সে তাঁহার কাছে আসিয়াছে, তিনি দয়া করিয়া যদি তার একখানি ছবি আঁকিয়া দ্যান্! তার এখনকার চেহারা নয়, সে তখন যেমন ছিল সেই চেহারা ; সেই জাঁকালো পরিচ্ছদে, নৃত্যের ভঙ্গীতে। সে চিত্রখানি তার প্রিয়তমের নামাঙ্কিত সেই কাষ্ঠফলকের

সামনে টাঙাইয়া রাখিবে। সে তো মূল্য দিতে পারিবে না, তাই নৃত্যের পোষাকগুলি আনিয়াছে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন!

দয়ালু চিত্রকর কহিল, "না, না, ও সব কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। আমি যে আমার ঋণ কিছু পরিশোধ করতে পারবো, এতেই আমার কত আনন্দ! আপনি কাল আসবেন। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ধনীর চিত্র যেমন মনোযোগের সহিত আঁকতুম, আপনার চিত্রও সেইরূপ আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আঁকবো।"

(৫)

পরদিন যথাসময়ে বৃদ্ধা আসিল। চিত্রকর কোমল শুভ্র রেশমের উপর তাহার ছবি আঁকিলেন। তাহার পূর্ণযৌবনের দিনে সে যেমন ছিল; পাখীর মতো উজ্জলনয়না, বংশযষ্টির মতো তন্বী নমনীয়া; স্বর্ণখচিত রেশমী

পোষাকে পরীর মতো দীপ্তোজ্জ্বল! প্রতিভাবান চিত্রকরের তুলিকাসম্পাতে লুপ্ত শ্রী ফিরিয়া আসিল, ম্লান সৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার বিকশিত হইয়া উঠিল! চিত্রকর ছবিখানি মূল্যবান রেশমী কাপড়ের উপর আঁটিয়া দিয়া টাঙাইবার জন্য রেশমী ফিতা সংযুক্ত করিয়া দিল। তারপর ছবির উপর স্বনামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিয়া শাদা কাঠের বাক্সে পুরিয়া বৃদ্ধাকে দিল। তৎসঙ্গে কিছু অর্থও দিতে যাইতেছিল, বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ না করিয়া সজল নয়নে বলিল, "আমার আর কিছুই প্রয়োজন নেই। এই ছবিখানিই আমি চেয়েছিলুম, এরই জন্যে ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেছি। ভগবান সে প্রার্থনা শুনেছেন, এ জীবনে আমি আর কিছু চাই না।" বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধে তাহার পোষাকগুলি চিত্রকরকে গ্রহণ করিতে হইল। বৃদ্ধা তাহার বাসস্থানের সন্ধান কিছুতেই বলিল

না, কহিল তাহার বাসস্থান অতি হীন, তাঁহার তুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যে[illegible]ার উপযুক্ত নয়।

চিত্রকর তাহার এক ছাত্রকে বৃদ্ধার অলক্ষ্যে তাহার অনুগমন করিয়া তাহার বাসস্থান দেখিয়া আসিতে কহিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সহরের বাইরে নদীর চড়ার ওপর যেখানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে ফাঁশি দেওয়া হয়, সেইখানে একখানা নোঙরা কুটীরে বৃদ্ধা থাকে।" চিত্রকর উঠিয়া বলিল, "চল, সেই নোঙরা কুটীরে আমাকে [illegible] চল।"

* * *

কুটীরের দরজা বন্ধ ছিল, চিত্রকর তাহাতে ঘা দিতে লাগিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, নদীর ধারে আকাশ শোণিতের মতো লোহিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের মনে [illegible]ড়িয়া গেল, বহুবৎসর আগে আর একদিন আর একস্থানে ইহারই দ্বারে সে প্রবেশের জন্য এমনই ব্যগ্র-

ভাবে ঘা মারিয়াছিল! ভিতর হইতে কোনো উত্তর না পাইয়া সে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিলে দরজাটা খুলিয়া গেল।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল জীর্ণ ঘরের মেঝের উপর একখানা পাতলা মলিন লেপ গায়ে দিয়া বৃদ্ধা ঘুমাইতেছে। ঘরের এক ধারে সেই পুরাতন বুৎসুদান, একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ সেখানে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। বুৎসুদানের উপরে যে "করুণা-দেবী"র ছবি ছিল সেখানা নাই, কিন্তু বুৎসুদানের সামনের দেয়ালে চিত্রকর অঙ্কিত ছবিখানি টাঙানো আছে।

চিত্রকর তখন বৃদ্ধাকে ডাকিল; সে নড়িল না, কোনো উত্তরও দিল না। বৃদ্ধ নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার আত্মা প্রিয়তমের কাছে চলিয়া গিয়াছে! তাহার [illegible] কি এক অনির্দ্দিষ্ট কোমলতায় উদ্ভাসিত, [illegible]ার বার্দ্ধক্যের রেখা-গুলি চিত্রকর অপেক্ষাও শক্তিমান্ কোন্ এক ওস্তাদের করস্পর্শে মিলাইয়া গিয়াছে!

পাহাড়ে মেয়ে

শীতকাল। চারিদিক তুষারে ঢাকা পড়িয়াছে। পথ, ঘাট, মাঠ শাদা হইয়া গিয়াছে। পথ চিনিয়া চলা দুঃসাধ্য।

পাহাড়ে দেশ। লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়। দু একখানা কুটীর কেবল মনুষ্য-জীবনের পরিচয় দিতেছে। সেই জনহীন দুর্গম পথে অশ্বারোহনে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছে! যে স্থানে রাত্রি কাটাইবে স্থির করিয়াছিল সে স্থান এখনো অনেক দূর। শীতের ভীষণ রাত্রি আসিতে আর বিলম্ব নাই; তার উপর এইমাত্র আবার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাস উঠিয়াছে। বরফের কণাগুলো তাহার নাকে মুখে চোখে আঘাত করিতেছে; শ্রান্ত ঘোড়াটা আর

চলিতে চাহে না। শীতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, লাগাম ধরিয়া রাখা যায় না। সে কোথায় যাইবে! কি করিবে! আশ্রয় একটু কোথায় মেলে!

ঐ না! ঐ যে ঐ পাহাড়ের মাথায় এক খানি কুটীর দেখা যাইতেছে! আঃ কি আনন্দ! মরুপ্রান্তরে জল দেখিয়া বুঝি তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের এত আনন্দ হয় না!

অনেক কষ্টে ঘোড়াটাকে লইয়া সে কুটীরের ধারে উপনীত হইল। কুটীরের আসে পাশে দীর্ঘ তুষারাচ্ছাদিত দেবদারু গাছগুলো ঝড়ের বেগে নুইয়া পড়িতেছে। কুটীরের মোটা কাঠের কপাট বন্ধ। তাহাতে সে সজোরে আঘাত করিল।

এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিল। সেই সুদর্শন পথিকের দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, "আহা! ভদ্রলোক কত কষ্টই পেয়েচে! আসুন, আসুন।"

তোমোতাদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। কুটীরের পিছনে একটা ছাউনির তলায় অশ্বটিকে বাঁধিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে,—সেই আগুনে এক বৃদ্ধ ও এক নবীনা হাত গরম করিতেছিল। তাহারা সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে আগুনের ধারে আহ্বান করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আগন্তুককে তাহার ভ্রমণ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে করিতে আগুনের উপর 'সাকে' গরম করিতে লাগিল। আহার্য্যও প্রস্তুত হইতেছিল!

তরুণী পর্দ্দার অন্তরালে উঠিয়া গেল। তাহার পরণে ছিন্ন মলিন বসন। মাথায় চিরুণি পড়ে নাই, আলুলায়িত কুন্তল এলোমেলো ভাবে পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ সমস্তের মধ্য হইতেও তাহার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে! এই জনহীন পার্ব্বত্য-প্রদেশে এ রত্ন কেমন করিয়া আসিল! কেন,

তিমিরগর্ভ কয়লার কদর্য্য খনিতে কি হীরক থাকে না ?

বাহিরে উদ্দাম বাতাস কপাট নাড়া দিতে লাগিল, কুটীর কাঁপাইতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিল, "গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে ; বাইরে ভারি বরফ পড়ছে। পথ চিনে ত আপনি যেতে পারবেন না। আমাদের কুঁড়ে ঘর, ভারি নোঙরা ; এখানে থাকতে আপনার অসুবিধেও হবে অনেক। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন ত আজ রাত্তিরের মতো গরীবের এখানেই থেকে যান। আপনার ঘোড়ার কোনো অযত্ন হবে না।"

এ বিনীত অনুরোধ তোমোতাদা এড়াই-বার চেষ্টা করিলনা। বরং তরুণীকে ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দলাভ করিল।

এইবার আহার আসিল সাধারণ রকমের হইলেও পরিমাণে প্রচুর। তরুণী

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল। এবার সে একটি পরিষ্কার পোশাক পরিয়াছে, মুক্ত কেশ আঁচড়াইয়া মসৃণ করিয়াছে। সে যখন নত হইয়া তোমোতাদার 'সাকে'র পেয়ালা পূর্ণ করিতেছে তখন যুবক বুঝিল তাহার জীবনে সে এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী আর দেখে নাই। তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর মাধুর্য্য তাহাকে মূঢ় করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কিন্তু বলিল, "আমাদের মেয়েটি এই পাহাড়ে দেশে একলা মানুষ হয়েচে তাই সে ভদ্রলোককে কি ভাবে আদর যত্ন করতে হয় তা জানে না। ওর অক্ষমতা দয়া করে মার্জ্জনা করবেন।"

তোমোতাদা সুন্দরীকে দেখিবে না আহার করিবে! সে অনিমেষলোচনে তরুণীর মুখ পানে চাহিয়াছিল। তরুণীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি করিবে সে

তাহার মুখের উপর হইতে চোখ সরাইতে পারিতেছিল না।

আহার অস্পৃষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিল, "মশাই দয়া করে কিছু খান! আমরা গরীব মানুষ, ভালো খাবার আর কোথায় পাব? শীতে বড় কষ্ট পেয়েচেন একটু কিছু না খেলে অসুখ করবে।"

তাহাদের সন্তোষসাধনের জন্য তোমোতাদা সাধ্যমত পানাহার করিল। ইতিমধ্যে কিন্তু সেই লজ্জানম্রা তরুণী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে! সে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিল, তাহার বাণী তাহার মুখের মতোই মধুর! পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকালয়ের বাহিরে লালিত হইলেও, তোমোতাদার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে বালিকার মাতাপিতা নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্তবংশ-সম্ভূত; নহিলে তাহার এরূপ মার্জ্জিত ভাষা ও ভঙ্গী হইতেই পারে না।

তোমোতাদা মনের আনন্দ আর গোপন করিতে না পারিয়া হঠাৎ তরুণীকে কবিতায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল :

আপনার মনে চলেছিনু কাজে
সহসা পথের ধারে
যা' দেখিনু চোখে ফুল ব'লে হায়
ভুল হ'য়ে গেল তারে।
কাজে যাওয়া আর হ'লনা আমার
হেথাই কাটিল বেলা,
বুঝিতে না পারি অকালে কেন এ
প্রভাতী রঙের মেলা!

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তরুণী উত্তর দিল :

অঞ্চলে আমি আলোর আভাস
আড়াল করিয়া রাখিগো যদি
তবে বুঝি মম প্রভু প্রিয়তম
রহিবেন হেথা বেলা অবধি!

তোমোতাদার বুঝিতে বাকি রহিল না

যে তাহার অনুরাগ প্রত্যাখ্যিত হয় নাই। তরুণী যে কবিতা দ্বারা স্বীয় মনভাব ব্যক্ত করিল তা তোমোতাদার অন্তর কি এক নাম-হীন পুলকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহার কবিতা রচনার শক্তিও তাহাকে বিস্মিত করিল। এমন স্ত্রী, এত সুন্দর এমন বুদ্ধিমতী, সারা বিশ্ব খুঁজিলেও মিলিবে না! তাহার অন্তরের মধ্যে কে যেন চুপে চুপে বলিতে লাগিল, এমন রত্ন হেলায় হারাইওনা!

তোমোতাদা মুগ্ধ, মোহিত হইয়া গিয়াছিল, তাই কোনো ভূমিকা না করিয়া স্বীয় নাম ধাম ও বংশের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধ দম্পতীর নিকট কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিল। তাহারা এ কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে, বিস্ময়ের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল:

"মশাই আপনি বড় ঘরের ছেলে, সামুরাই; আমাদের মেয়েটি লেখাপড়া শেখেনি, ভদ্রতাও

জানে না—তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে সে তো আমাদের ভাগ্যি! কিন্তু সে তো আপনার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়, ওকে আপনি দাসী করে রাখবেন। তা হলেই যথেষ্ট।"

প্রভাতের পূর্ব্বেই ঝড় থামিয়া গিয়াছে। নির্মেঘ পূর্ব্বাকাশ রাঙা করিয়া সূর্য্যোদয় হইল। তুষারের উপর অরুণকিরণ পড়িয়া দিকে দিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই প্রভাতসূর্য্যের কিরণের ন্যায় লজ্জিত মুখের গোলাপী আভা অঞ্চল দিয়া তাহার প্রেমাস্পদের চক্ষু হইতে ঢাকিলেও তোমোতাদার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই! কিন্তু তরুণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও অসম্ভব; তাই যখন যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন সে বৃদ্ধবৃদ্ধাকে কহিল, "আমি যা পেয়েছি তারও বেশি কিছু চাওয়া উচিত নয় কিন্তু আমি আবার আপনাদের

মেয়েটিকে চাইচি। তার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারবো না। আপনাদের মেয়েরও আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি নেই। আমার হাতে তাকে দিন, তার কথনো অনাদর হবে না। আপনাদের কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। কালকের আদর যত্নের জন্যে এই সামান্য কিছু নিন।"

বৃদ্ধ কিন্তু মোহরের থলিটি আস্তে-আস্তে সরাইয়া দিয়া কহিল, "আপনার বড় দয়া। ও আপনি রাখুন, অনেকটা পথ যেতে হবে, ওগুলি আপনার কাজে আসবে। আমাদের অল্পেতেই সংসার চলে, টাকাকড়ি নিয়ে কি করব? আমরা কবে আছি কবে নেই, আমাদের মেয়েটির যে একটা গতি হ'ল এ আমাদের ভাগ্যি। আমাদের বাছাকে আপনার হাতেই দিলুম, আপনার সঙ্গেই যেতে চায়। বাছার যেন অনাদর না হয়, আহা! সে যে আমাদের ছেড়ে কথনো

থাকেনি", বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

একের মিলন অন্যের বিচ্ছেদ—জগতে এইরূপই অহরহ ঘটিতেছে!

শুভস্য শীঘ্রং! তোমোতাদা সুন্দরীকে নিজের পাশে ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইল। তাহার পিতামাতাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আনন্দিতচিত্তে যাত্রা করিল।

(২)

তখনকার দিনে সামুরাই প্রভুর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে পারিত না। যে কাজে তোমোতাদা বাহির হইয়াছিল তা সম্পন্ন না করিয়া অনুমতি গ্রহণ করাই বা যায় কেমন করিয়া! সেই জন্য কিওতো পৌঁছিয়া তোমোতাদা সুন্দরীকে সযতনে লুকাইয়া রাখিল; পাছে তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয় হোসোকাওয়া-রাজ তাহাদের মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটাইয়া স্থান্। তিনি যে সুন্দর মুখের ভারি ভক্ত!

কিন্তু কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সুন্দরীকে হঠাৎ একদিন হোসো-কাওয়া-রাজের এক অনুচর দেখিয়া ফেলিল ও স্বীয় তরুণ প্রভুকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। অবিলম্বে সুন্দরীকে বিনা বাক্যব্যয়ে তোমোতাদার নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল!

তোমোতাদার দুঃখ বাক্যে বর্ণনা করা যায় না! 'দাইম্যো'র তুলনায় সে সামান্য একজন কর্ম্মচারী, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারে! আর সে ত যোদ্ধার নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে, প্রভুর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া গোপনে বিবাহ করিয়াছে! কেমন করিয়া সে প্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিবে? উভয়ে এদেশ ছাড়িয়া

পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই! কিন্তু পলাইবে কেমন করিয়া? পত্র লিখিবে? 'দাইম্যো'র অন্তঃপুরে প্রেমপত্র পাঠানো, তা-ও ত একটা বিষম ব্যাপার! যদি ধরা পড়ে?

নানা চিন্তার পর পত্রের পরিবর্ত্তে সে একটি কবিতা রচনা করিল। তাহার গভীর প্রেম ও অসীম বিরহবেদনা কবিতামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রিয়া সন্নিধানে চলিল:

হায়, মণি-লাবণিয়া তরুণীর চোখে
অবিরল জলধার,
আজি, কাছে কাছে রহি' রাজার কুমার
পাছে পাছে ফিরে তার।
ওগো, বড়র পীরিতি সাগরের রীতি,
উচ্ছ্বাসে সুগভীর;—
হায়, আমি দুর্ভাগা ফিরি আজ একা
প্রান্তে এ পৃথিবীর।

কবিতাটি প্রেরিত হইবার পরদিন সন্ধ্যার সময় 'দাইম্যো'র নিকট তোমোতাদার তলব

পড়িল। তোমোতাদা ভাবিল এইবার দফা রফা! কিন্তু এ জীবন লইয়াই বা লাভ কি? এ বিচ্ছেদযন্ত্রণা সে আর সহ্য করিতে পারে না! তাহার মরণই ভাল!

হোসোকাওয়া-রাজ সভায় সামুরাই পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তোমোতাদা যখন অভিবাদন করিতে অগ্রসর হইল, তখন সভায় যে নিস্তব্ধতা তা ঝটিকার পূর্ব্বের নিস্তব্ধতার মতো ভয়াবহ। কি এক অজানিত বিপদাশঙ্কায় তোমোতাদার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে অভিবাদন করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু এ কি! এ তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! প্রভু যে মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার হা[illegible] [illegible]রিলেন! ভয়ে ভয়ে তোমোতাদা মুখ তুলিয়া দেখে তাঁহার চোখে অশ্রু টলমল করিতেছে। তিনি কহিলেন, "তোমার কবিতা আমি পড়েছি। তোমাদের

মধ্যে যে গভীর প্রেম সে প্রেমে বাদ সাধতে পারবো না। অভিন্নহৃদয় তোমাদের দু'জনকে আমি ঠাঁই ঠাঁই করব না। আজ এই সভায় সকলের সামনে তোমাদের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হবে।"

অচিরাৎ সভাগৃহের পার্শ্বদেশের পর্দা সরিয়া গেল ও লজ্জারক্তিম মুখে বধূবেশে তরুণী স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল!

(৩)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যায় আগুনের ধারে পতিপত্নী বসিয়াছিল। বাহিরে ধূসরবর্ণ চন্দ্রতারকাহীন আকাশ হইতে অবিরাম তুষারপাত হইতেছে। বায়ু হাহা রবে কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

তোনোভাদার মনে পড়িল আর এক রাত্রে বাতাস এমনি ভাবে বহিতেছিল, তুষারপতনেরও বিরাম ছিল না। সেই রাত্রে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ!

• • •

হঠাৎ কাতর চীৎকার শুনিয়া তোমোতাদা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখে স্ত্রীর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে। শশব্যস্তে সে তাহাকে দুই হাতে ধরিল। স্ত্রী ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিলুম, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু বেদনাটা এমনি হঠাৎ এসেছিল! আমাদের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এ জন্মে আমাদের মিলন হয়েছিল, আবার পরজন্মেও হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। তুমি অবিশ্বাস করচো? কিন্তু সত্যিই আমি মরচি। তোমাকে এতদিন বলি নি যে আমি মানুষ নই। একটা গাছের আত্মা হচ্ছে আমার আত্মা; গাছের অন্তঃকরণ আমার অন্তঃকরণ। দেবদারু গাছের যে রস তা-ই আমার প্রাণ। এই মুহূর্ত্তে কে আমার গাছটি কাটচে তাই আমি মরচি। তবে চল্লুম...... !"

আবার যন্ত্রণাকাতর চীৎকার! প্রতি

মুহূর্ত্তে তাহার শরীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, শেষে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তোমোতাদা ব্যাকুল আগ্রহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কোথায় সে! কেবল যে রেশমী পোষাকটা পড়িয়া রহিয়াছে!

০ ০ ০ ০

বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিয়া তোমোতাদা দেশভ্রমণে বাহির হইল। সংসারে আর তাহার আসক্তি নাই! প্রিয়ার স্মৃতি বুকে ধরিয়া তীর্থে তীর্থে কতদেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একদিন সেই পাহাড়ে দেশে আসিয়া উপস্থিত। দেখিল সে কুটীর ধূলির সহিত মিশিয়াছে। আছে কেবল তিনটি ছিন্নকাণ্ড দেবদারু গাছের মূল; দুইটি প্রাচীন ও একটি নবীন গাছের। গাছগুলি দেখা গেল সে আসিবার বহু পূর্ব্বে কাটা হইয়াছে!

তোন্‌সাকুর বিপত্তি

"কি সুন্দর চাঁদ! মন্দপ্রভ সূর্য্যের মতো!" রাত্রিকালে এক বন্ধুর পর্ব্বতের উপরে উঠিতে উঠিতে তোন্‌সাকু এই কথা বলিল। পাহাড়টি ভয়াবহ "হেন্‌জেয়্যামা" বা "বহুরূপী দৈত্য।" রাত্রে ত দূরের কথা, দিবাভাগেও কেহ এ পাহাড়ে উঠিতে সাহস করে না।

কিন্তু তাতে আসে যায় কি। সে ত ব্যবসায়ী লোক, সাধু; কুসংস্কারে বিশ্বাস করিবার সময় তাহার নাই। টাকা উপার্জ্জন করাই তাহার কাজ এবং "সাকে" পানে টাকা খরচ করাতেই তাহার আনন্দ। সে কাহারো মতের ধার ধারে না, বে আমুদে লোক এবং নিজেকে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চালাক চতুর বলিয়া জানে।

সে এখানে দৈত্যটিকে মারিতে আসে নাই,—সুধাংশুর রজত-কিরণ-পরিস্নাত রজনীর দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্য আসিয়াছে। আর একটু সঠিক ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয়, এরূপ নয়ন-বিমোহন দৃশ্যের মাঝখানে "সাকে" পান করিতে আসিয়াছে। এমন দৃশ্যের মাঝে মদ বেশ মিষ্ট লাগে !

নিম্নভূমির উপর চন্দ্র সুবিমল জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিয়াছে। তোন্‌সাকুর মুখের উপর দিয়া এইমাত্র যে মিঠে হাওয়া বহিয়া গিয়াছে, তোন্‌সাকুর মন তাহারই মতো হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক হইয়া এই শব্দহীন, অবসাদজনক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল। বৃক্ষপত্রের সির্ সির্ শব্দ ছাড়া সে কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না ; মধ্যে মধ্যে কেবল দূরাগত পেচকের ডাক স্থানটিকে কিছু ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সে এই পাহাড়ের

মালিক, বহুরূপী দৈত্যের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না।

"এ স্থানটা একটু যেন বেশীরকম নির্জ্জন।" —সে জোরে জোরে বলিল, এবং কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চাহিয়া, "আমি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করি না যতক্ষণ আকাশে ঐ চাঁদ আছে, আর আমার—এই আছে" বলিল। তারপর বুকের ভিতর হইতে মদের বোতলটি বাহির করিয়া ঈষৎ হাস্যে চাঁদের দিকে তুলিয়া ধরিল ও মুখে লাগাইয়া এক চুমুক পান করিল।

"আমাকে 'সাকে' দাও আর চাঁদ দাও আমি আর কিছু চাই না!"—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এক হাতে মদের বোতল ও অন্য হাতে টুপি লইয়া সে আপন মনেই পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ সে থামিয়া গেল, আর এক পাও অগ্রসর হয় না। তাহার চোখের সাম্‌নে কি

একটা প্রকাণ্ড কালো পদার্থ রহিয়াছে! চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া সে কিছুক্ষণ পদার্থটার দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার শরীর তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। পরক্ষণেই সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

"পাহাড়ের নেই কিছু করেচে!"—ঘৃণার স্বরে এই কথা বলিল। "চম্‌কে দিয়েছিল আর কি! সুসভ্য 'মেইজি'-যুগে ভূত বলে পদার্থ যে নেই তা বিলক্ষণ জানি। এই পাহাড়ের বিষয়ে লোকে কত ভয়ঙ্কর গল্প বলে তা যে সব গুলিখুরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি মানুষ, দুনিয়ার মালিক; আমার ওপর নীচ শেয়াল বা বেঁজির কোনো জোর থাকতেই পারে না।"

এই চিন্তা তাহার মনে সাহস আনিয়া দিল, তাঁহার নিজের উপর বিশ্বাস আরো বাড়িয়া গেল। দৃঢ়পদে হাল্কা মনে সে

অগ্রসর হইতে লাগিল। অবিলম্বেই সে পাহাড়ের মাথায় কোমল তৃণের উপর উপবেশন করিল। সেখান হইতে অসীম নৈশ আকাশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আকাশের মাঝে চন্দ্রমা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। পাহাড়ের চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি দূরে যেন কোটি-তারকা-শোভিত আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার নিজের গ্রাম ঐ অনেক দূরে, স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট!

এইবার তোন্‌সাকু আনন্দিত মনে বোতল খুলিয়া তাহার বড় আদরের সুরাপানে মনোনিবেশ করিল। প্রত্যেকবার পাত্র পূর্ণ করে আর চাঁদের দিকে তাকায়। যতটা পান করা উচিত তার চেয়ে অনেকটা অধিক শীঘ্রই সে পান করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ চাঁদের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বড় গান গাহিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যের মাঝে গাহিবার সাহস

তাহার হইল না। চক্ষু দুটি যেন আনন্দে সাঁতার দিতে লাগিল, হাতে তালি পড়িতে লাগিল এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে আনন্দে অধীর হইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিষম অঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত নৃত্য জুড়িয়া দিল। সে তখন স্ফূর্তির সপ্তম স্বর্গে!

পশ্চাদ্ভাগ হইতে কে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নমস্কার তোন্‌সাকু; নিজে নিজেই খুব ফূর্তি হচ্চে যে!"

"কে রে তুই?" আশ্চর্য্য হইয়া তোন্‌সাকু বলিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখে একটা লোক। "তুই আবার কোত্থেকে উঠ্‌লি?"

নবাগত বলিল,"আমি তোমার প্রতিবেশী গোন্‌সুকে।" সে পরিহাসের সুরে বলিল, "এমন চাঁদের তলায় ফূর্তি করা বেশ!"

"ওঃ, তুমি গোন্‌সুকে নাকি? মাপ কর ভাই, তোমাকে প্রথমে চিন্‌তে পারি নি। তুমি কোনো শব্দ না করে হঠাৎ এমন ভাবে

এসেছিলে, আমি মনে করেছিলুম ভূত। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

নবাগত কহিল, "দেখ তুমি এমন গোলমাল করছিলে যে আমার পায়ের শব্দ শুনতে না পাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমার উদ্দেশ্যও তোমারই মতো, চাঁদের তলায় একটু ফূর্ত্তি করা।"

"এস! এস!" তোন্‌সাকু উৎফুল্ল চিত্তে বলিল, "বসে যাও আমার সঙ্গে। আমি ভূত দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়, নির্জ্জন জায়গায় একলা থাকা ত দূরের কথা। আহা এমন রাত্রে একজন মনের মতো লোকের সঙ্গে 'সাকে' পান করতে করতে আলাপ করতে কত সুখ!"

তোন্‌সাকু মদিরাপাত্র পূর্ণ করিয়া বন্ধুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "খেয়ে ফেল, আবার ভর্ত্তি করে দিই। কি? আর খাবে না? এমন কথা বোলো না। খেয়ে

যাও ভাই, খেয়ে যাও। 'নবাগতকে তিন পাত্র দাও,' এইটেই হল নিয়ম,—জান ত। খেয়ে যাও, দশবার খাও, বিশবার খাও! যতক্ষণ এক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে ততক্ষণ খাওয়া যাক্ এস।"

তোন্‌সাকু ও গোন্‌সুকে অনেকবার প্রচুর পান করিল।

কিছুক্ষণ পরে তোন্‌সাকু দেখিল তাহার বন্ধু এত পান করিয়াছে তবু তাহার মুখে কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। সে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তোন্‌সাকু একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "গোন্‌সুকে তুমি ত দেখ্‌চি মজার লোক। তোমার হল কি, গম্ভীরভাবে বসে রইলে যে? চাঁদের নীচে এমন গম্ভীর লোক মানায় না। উঠে পড়, নাচ গাও ফূর্ত্তি কর। শুন্‌চ?"

গোন্‌সুকে কিন্তু পূর্ব্ববৎ চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছে, প্রতি মুহূর্ত্ত সে যেন আরো গম্ভীর

হইতেছিল। তোন্‌সাকুর বিষম ক্রোধের উদ্রেক হইল।

"তবে রে বাঁদর! উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। তবে এই নে!" বলিয়া তোন্‌সাকু খালি বোতলটা তাহার গায়ে ছুড়িয়া মারিল। অমনি গোন্‌সুকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোথা হইতে একটা বিকট, অমানুষিক চীৎকার ভূমি ফুঁড়িয়া উঠিল। তোন্‌সাকু ত ভয়ে অর্দ্ধমৃত; সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সামনে চাহিয়া দেখে গোন্‌সুকের স্থানে এক ভীষণদর্শন বিরাটদেহ দৈত্য। তাহার মুখ সর্পের মতো, চক্ষু হইতে আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছে। দৈত্যের দেহ ক্রমশ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, অবশেষে আকাশে মিশিয়া গেল।

"ওরে বাপ্‌রে!" বলিয়া ... ন্‌সাকু অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

* * * * *

চন্দ্র এখন পূর্ব্বগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে; বহুক্ষণ পূর্ব্বে দ্বিপ্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। মুক্ত আকাশতলে থাকিয়া এবং রাত্রিশেষের আর্দ্রবাতাস গায়ে লাগাতে বেচারা তোন্‌সাকুর চেতনা ফিরিয়া আসিল। আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চক্ষু মেলিয়া সে তাহার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল আকাশে তখনো চাঁদ আছে কিন্তু দৈত্যটা নাই। সেই ভয়াবহ মূর্ত্তিটা কিন্তু তখনো তাহার চোখের সামনে ভাসিতেছে, কানে তখনো সেই বিকট চীৎকার লাগিয়া রহিয়াছে। সে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, যেন তাহার শরীরের ভিতর কে বরফের জল ঢালিয়া দিয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত ক'রয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া সে কি করিবে ভাবিতে লাগিল। সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া নামিয়া যাইবে কি? না, সে বড় বিপজ্জনক। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এই ভাবে

থাকিবে? কিন্তু তাহার মদ যে সব ফুরাইয়া গিয়াছে!

বেচারা কাঁদিয়া বলিল, "হায়, হায়, আমার কি হবে?"

ঠিক সেই সময়ে পদশব্দ শুনা গেল। নিশ্চয়ই কোনো লোক পাহাড়ের উপর উঠিয়া আসিতেছে!

তোন্‌সাকু উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। "রাম! রাম! বাঁচা গেল, ঐ যে ক জন গাঁয়ের লোক আস্‌চে!" সে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তাহারা তিন জন, সকলেই তোন্‌সাকুর নিকট-প্রতিবেশী। তাহাদের মধ্যে একজন তোন্‌সাকুকে সেই ভাবে গুঁড়ি গুঁড়ি মারিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কে হে তোন্‌সাকু নাকি? কিছু অদ্ভুত দেখ্‌চ?"

"অদ্ভুত!" তোন্‌সাকু বলিল, "উঃ কী ভীষণ! কী ভয়ানক!"

"আমি কিছু বুঝতে পারচিনে, তোন্‌সাকু ; কি দেখেচ বল।"

"দৈত্য দেখেছি, একটা, ভীষণদর্শন, প্রকাণ্ড লম্বা, কী বিকট চীৎকারই করেছিল, আর—"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "কি ? সে চীৎকার কি এমনই বিকট ছিল ?" * * *

সেই মুহূর্ত্তে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া এক বিকট চীৎকার উত্থিত হইল এবং সেই লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর একজন প্রতিবেশী ভীত তোন্‌সাকুর ঘাড় ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিল, "এখনো তুমি নিজেকে দুনিয়ার মালিক বল ? দৈত্যটা এই রকম দেখতে ছিল কি ?" দ্বিতীয় প্রতিবেশী অদৃশ্য হইল এবং তাহার স্থলে ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট বিরাটাকার দৈত্য আবির্ভূত হইল। দৈত্য বার বার ঐ একই প্রশ্ন করিতে লাগিল—

"দৈত্যটা এই রকম ? এই রকম ?" প্রত্যেক "এই রকম"-এর সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার মস্তক আকাশের চন্দ্রের সহিত মিশিয়া গেল !

গ্রন্থকারকে উপহার দিতে হয়। ভাষাও বেশ ভালো... যাঁহারা জাপান সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক তাঁহারা এই পুস্তকে যথেষ্ট আনন্দ ও কৌতুকলাভ করিবেন।

Amrita Bazar Patrika—This is indeed an excellent little work in Bengalee, in the branch of literature relating to travels. The little work by Suresh Chander shows that he was studying... Japan and its people as one who earnestly looks around and not merely sees....The book presents in simple colloquial Bengali, simple yet crispy colloqnial yet chaste—a picture of the Japanese people as they appear move and live at home that is, in their home garb and not in the gala decorations meant for the outside world...Babu Suresh Chander has brought out certain facts which cannot fail to interest us... The book under review is extremely valuable in bringing out the similarities between the Indian and Japanese institutions. The get up of the book is nice. The pictorial representations of sceneries, temples and characters have immensely added to the value of the book. The

price one rupee and eight annas is cheap considering the worth of the work. We heartily recommend it to the public.

হিতবাদী। লেখক ভাষা জানেন, গল্প লিখিতে পারেন, সংবাদ কি ভাবে বিন্যাস করিতে হয়, তাহাও জানেন...নবীন লেখকের মেধার ও মনীষার পরিচয় পাইয়াছি...বহিখানি বেশ হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে—অতি মধুর চিত্তবিনোদক হইয়াছে।

ভারতী ...গ্রন্থখানিতে জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বেশ হৃদয় দিয়া আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখিবার শক্তিও তাঁহার সাধারণের মত নহে। উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, মলাট প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। চিত্রগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কারণ তাহা হইতে লেখকের বক্তব্য প্রস্ফুটতর হইয়াছে। ভাষাটুকু সরল।...

বঙ্গবাসী।...নূতন ধরণে বাঁধা। ছাপা, কাগজ, ছবি চমৎকার। লিখনভঙ্গী বেশ। আবশ্যক বিষয়ে বর্ণনা মনোমদ। জাপান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পক্ষে যে এ গ্রন্থ সুহৃৎ ও সহায়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।...

সুপ্রভাত।—....পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। জাপানের জাতীয় পতাকার ন্যায় মলাটখানি শ্বেতবর্ণের মধ্যখানে লালবর্ণের উদীয়মান সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে...গ্রন্থকার যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সাতিশয় মনোরম হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল এবং সুমিষ্ট। গ্রন্থখানি জাপানকে উজ্জ্বলরূপে মানস-নয়নের সম্মুখে আনয়ন করে। গ্রন্থকার নিরপেক্ষরূপে জাপানের দোষগুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ...আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সকলেই এই মনোরম পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।...

Indian Daily News—It is an excellent narrative of the author's travels in Japan, containing the social and religious customs and the important historical events of Japan, the scenery of her Capital and of the ways and means of living of her inhabitants. We congratulate the author for the interesting work, which will no doubt be welcome to the reading public of Bengal...

সঞ্জীবনী।...সুরেশবাবু যে তীক্ষ্ণদর্শী তাহার কোন সন্দেহ নাই। জাপানের দোষগুণ সমস্তই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছেন। * * তাঁহার

বর্ণনা শক্তিগুণে জাপানের অনেক বিষয় পাঠকের মনে জীবন্ত ছবি অঙ্কিত করিবে।

Bengalee...This book contains a description of the author's voyage to Japan, the capital, society, education, etc, written in a simple and homely style ...as a book of travel—it contains many useful informations regarding the University, the mode of living, expenses of education, messing, boarding and the behaviour of the Japanese towards foreigners and many other topics which are wanted here by many interested persons. The general public will find in it many things interesting for them. The maiden attempt of the juvenile author is laudable.

নব্যভারত।...এমন সুরচিত গ্রন্থ বাঙ্গালায় সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণত বিদ্যার্থী যুবকেরা বিদেশের যে সকল বৃত্তান্ত লেখেন, তাহাতে লেখকদের বীরত্বের অনুভূতি আছে, এই টুকুই জানা যায়; সে সকল লেখা পড়িয়া কোন জ্ঞাতব্য কথাই সংগ্রহ করা যায় না। লেখকও বিদ্যার্থীরূপেই জাপানে পাঁচ বৎসর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় সমগ্র জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি চমৎকার বুঝিতে

পারা যায়। লেখকের ভাষা অতি সরল ও৷ স্বচ্ছ, লিপিভঙ্গীও মনোহর; তাহার উপর অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট চিত্র দেওয়া হইয়াছে ।...

Modern Review...The lovely get up of the volume—its neat printing, good paper and beautiful binding—is in keeping with the excellence of its contents. We have read a good many books on Japan by European, American, Japanese, and Indian writers, but we do not remember to have come across one which is so interesting and so well-written from the Indian point of view. The writer knows the art of bringing out the core of the matter in a few short sentences. His style is exceedingly charming and he writes from intimate personal knowledge. The beautiful illustrations with which the book abounds are a treat in themselves....

রসা ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

সম্পূর্ণ দেশীয় মূলধনে স্থাপিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক কারখানা।

প্রধান কেমিষ্ট্ শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাপানের তোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ ফার্ম্মাসীতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কারখানা পরিচালনের অভিজ্ঞতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে।

এখানে যাবতীয় ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি যন্ত্র-